বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ভূমিকাঃ

'ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ প্রেক্ষিত'

এম.ফিল. ডিগ্রি কার্যক্রমের আংশিক পরিপূরক গবেষণা পত্র

সৈয়দ জাভেদ মোঃ সালাহউদ্দিন
এম.ফিল রেজিস্ট্রেশন নং- ২২১/১৯৯৫-৯৬

Dhaka University Library
382762
GIFT
382762
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৯

M.Phil.

382762

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ভূমিকাঃ 'ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ প্রেক্ষিত'

এম.ফিল. ডিগ্রি কার্যক্রমের আংশিক পরিপূরক গবেষণা পত্র

সৈয়দ জাভেদ মোঃ সালাহউদ্দিন
এম.ফিল রেজিস্ট্রেশন নং- ২২১/১৯৯৫-৯৬

382762

তত্ত্বাবধায়কঃ অধ্যাপক ডঃ এ,এইচ, এম, আমিনুর রহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, সৈয়দ জাভেদ মোঃ সালাহ্ উদ্দিন কর্তৃক উপস্থাপিত " বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ভূমিকাঃ ইউনিয়ন পরিষদের বিশেষ প্রেক্ষিত"- শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত।

এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

382762

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তারিখ, ঢাকা
২৮/৮/৯৭

(ডঃ এ.এইচ.এম. আমিনুর রহমান)
গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

DHAKA UNIVERSITY ★ DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE ★

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর দিকে তাকালে এসব দেশের একটি সাধারন বৈশিষ্ট্যর দিকে সবারই দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে, তা হলো এসব দেশ দারিদ্রপীড়িত। দারিদ্রতা এদের উন্নয়নের ধারাকে বারবার বাধাগ্রস্থ করে চলেছে। এসব দেশের ক্ষমতাসীন সরকারগুলো বিভিন্ন উন্নয়নমূখী কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্রতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্রতা বিমোচন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের দিকেই তারা বেশী দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছে। কেননা, স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি মানুষের সমষ্টিক উন্নয়নের মাধ্যমেই দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিহিত। এসব উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জন, এবং একথা অনস্বীকার্য যে, বিশ্বের যে কোন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাই নেয়া হয় দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোনকে সামনে রেখে। কেননা, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক বিকাশই দারিদ্র বিমোচন ও সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। তৃতীয়বিশ্বের পশ্চাদপদ দেশগুলো অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মানে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল কেন্দ্র হিসাবে আজ প্রত্যন্ত গ্রামীন অঞ্চলের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেননা, উপনিবেশিকতার যাতাকলে পিস্ট এসব দেশের জনসাধারনের একটি বিরাট অংশই মূলতঃ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। এসব দরিদ্র, অবহেলিত মানুষের আর্থ-সামাজিক ভাগ্যর আমূল পরিবর্তন ব্যতিত এসব দেশের প্রকৃত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়।এ কারনে আজ তৃতীয় বিশ্বের বেশীরভাগ সরকারই সংবিধান ও আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত স্ব-স্ব স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিস্তারন ঘটাতে তৎপর।

মূলতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত্তোর কাল থেকেই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়নের ধারনার ব্যপকতা বিস্তার লাভ করে। বর্তমান সময়ে গনতন্ত্রের ব্যপক বিস্তৃতির ফলে এই ধারনা আজ শুধু প্রসার লাভ করেই ক্ষান্ত হয় নাই, বরঞ্চ একমাত্র স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা হিসাবেও দেশে দেশে এর বিস্তরন ও জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে আজ স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কর্তৃত্বের পরিধিকে সীমিত গন্ডীতে আবদ্ধ রাখছে। এর ফলেই আজ 'সংখ্যা লঘিষ্টের' ক্ষমতা বা ''মাইনরিটি পাওয়ারকেও'' বর্তমান গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে নিচ্ছে।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন । ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা সর্বপ্রথম গ্রাম-পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উল্লেখ পাই। বহুযুগের সৃষ্টি এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ইংরেজ শাসনামলে (১৭৫৭-১৯৪৭) বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে কালের আবর্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড রিপনের সময়কালে একটি প্রশাসনিক সংস্কারের আলোকে বৃটিশরা তাদের স্বার্থে আমলা নিয়ন্ত্রিত স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করেন। এসব সংস্থাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হিসাবে আইনের পাতায় স্থান দিলেও এগুলো আদৌ তা, ছিলনা। পরবর্তীতে ইংরেজ শাসন অবসানের পর পাকিস্তান আমলে (১৯৪৭-

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১) তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব আইয়ুব খানের (১৯৫৮-১৯৬৮) উদ্ভাবিত মৌলিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভিনব শাসন কার্যক্রমও দেশবাসী প্রত্যক্ষ করে। কার্যতঃ স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করে বাংলাদেশ আমলে, ১৯৭৬ সালে এক অধ্যাদেশের বলে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের একটি কাঠামো দাড় করানো হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৩ সালে আরেক অধ্যাদেশের বলে একে আরো জোরদার করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। বাংলাদেশে বর্তমান স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের সর্বনিম্ন ইউনিটের নাম হল 'ইউনিয়ন পরিষদ'। এই ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন পদক্ষেপ সরকার গ্রহন করেছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ইতিমধ্যে (১৯৯৯) দেশে পরীক্ষামূলকভাবে ১০৮টি ইউনিয়ন কমপ্লেক্স নির্মান করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব ও এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে অত্র গবেষনা পত্রটি সংশ্লিস্ট ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আওতায় বর্তমান গবেষনা কাজটি সম্পন্ন করা হয়। গবেষনা কাজের এই দীর্ঘ সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে আমি বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি।

এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম যিনি আমাকে এই গবেষনা কাজ চালানোর জন্য অফুরন্ত উৎসাহ, সাহস, অনুপ্রেরনা দিয়ে ধন্য করেছেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্বাবধায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এ,এইচ,এম আমিনুর রহমান। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁর কাছ থেকে সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুপ্রেরনা না পেলে আমার পক্ষে এ কাজ শেষ করা অসম্ভব ছিল। আমার ধৈর্য্য ও মনোবলকে অটুট রাখার পিছনে তাঁর এই নিস্বার্থ অবদানকে আমি আজীবন স্মরন করবো। এই গবেষনা কাজে আমি বিভিন্ন সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আতাউর রহমান, ডঃ ডালেম চন্দ্র বর্মণের কাছ থেকে যে মুল্যবান মতামত ও সহযোগিতা পেয়েছি তার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ গোলাম হোসেন আমাকে এই কাজে অনুপ্রেরনা দিয়েছেন এরজন্য আমি তার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ব্রিটিশ কাউন্সিল গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো গ্রন্থাগার, জাতীয় গনগ্রন্থাগার, জাতীয় স্বাস্থ্য গ্রন্থাগার (মহাখালী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী (ঢাকা), ডি,এফ,পি গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা'সত্যিই বিস্ময়কর। আমি এদের সবার প্রতি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টের সিনিয়র এডভোকেট সৈয়দ লুৎফর রহমান আমাকে স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত আইন-কানুন, বিধি-বিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন। এজন্য উনার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষনা প্রতিষ্ঠানের (স্পারসো) চেয়ারম্যান ডঃ এম, এ সোবহান আমাকে সংশ্লিস্ট গবেষনা ক্ষেত্রের স্পট ম্যাপ (কৃত্তিম উপগ্রহের সাহায্যে তোলা

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র) দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার নিজ পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে আমার মাতা দিলআফরোজ বেগম, বোনদ্বয় সৈয়দা ফারজানা সালেহ্উদ্দিন ও ফারিয়া আহমেদ ইমা ও একমাত্র ভাই ফারহান আহমেদ জ্যোতি আমাকে নিরবে সহযোগিতা করে আমার কাজ এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে তার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরিশেষে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মচারী জনাব নজরুল ইসলাম, ইলিয়াস উদ্দিন, আমিনুল ইসলাম সরকারের সহযোগিতা মোটেও ভুলবার নয়। নাম না জানা অনেকের অবদান রয়েছে এই গবেষনা কাজে। স্থানাভাবে তাদের সবার নাম উল্লেখ সম্ভব হলো না বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সবশেষে, মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে লাখো শোকরিয়া জানাচ্ছি।

চেষ্টা সত্বেও এই গবেষনা কাজে যদি কোন ভুলভ্রান্তি থেকে থাকে তবে তাতে আমার নিজ দায়-দায়িত্ব স্বীকার করছি এবং এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

সৈয়দ জাভেদ মোঃ সালাহ্উদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার	পৃষ্ঠা
সারনীসমূহের তালিকা	
অধ্যায়- ১	
গবেষণা সমস্যার গুরুত্ব	১
গবেষণা পরিকল্পনা	১
গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ	২
গবেষণা পদ্ধতি	৩
অধ্যায় উপস্থাপন পরিকল্পনা	৬
অধ্যায়-২	
বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ক্রমবিকাশের ইতিহাস	৯
প্রাক ইংরেজ আমল	১০
ইংরেজ আমল	১১
পাকিস্তান আমল	১৯
বাংলাদেশ আমল	২২
অধ্যায়-৩	
বাংলাদেশে গ্রামীণ অর্থনীতির প্রকৃতি ও সরকারী উন্নয়ণ কৌশল	৩১
অধ্যায়- ৪	
মধুখালী থানায় ইউনিয়ন ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা	৫৩
অধ্যায়-৫	
গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার ও সুপারিশমালা	৬৪
পরিশিষ্ট	৭২
নির্বাচিত তথ্যপঞ্জী	১০০

Dhaka University Institutional Repository

সারনীসমূহের তালিকা

১. মধুখালী থানাধীন ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের নমুনায়িত সদস্য, চেয়ারম্যান, কর্মকর্তা, পেশাজীবি এবং কৃষকবৃন্দের বর্ণনা।

২. মধুখালী থানা, ফরিদপুর জেলা ও বাংলাদেশের মধ্যে তুলনামূলক তথ্যাবলী।

৩. বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময়কাল।

৪. বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যচিত্র (১৯৬০-১৯৭০)।

৫. এশিয়া মহাদেশের কতিপয় নির্বাচিত দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের তুলনামূলক চিত্র (১৯৯৫)।

৬. বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার (১৯৯১-১৯৯৬)।

৭. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কালের বছরওয়ারী হিসাব (১৯৮৮-১৯৯৬)।

৮. বাংলাদেশে ভূমির বিভিন্নরূপ ব্যবহারের পরিসংখ্যান (১৯৮৮-১৯৯৫)।

৯. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহের উৎস।

১০. বাংলাদেশে দ্বিবার্ষিক (১৯৭৮-৮০) পরিকল্পনায় খাতওয়ারী ব্যয় বরাদ্দের চিত্র।

১১. বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক (১৯৮০-৮০) পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের উৎস।

১২. সংশোধিত ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান।

১৩. বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সেচের আওতাধীন ভূমির পরিমান।

১৪. কৃষি ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ (১৯৯১-১৯৯৭)।

১৫. বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর খতিয়ান (১৯৮৬-১৯৯৭)।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ১

গবেষনা সমস্যার গুরুত্ব

গবেষনা পরিকল্পনা

সমাজ নিয়তই পরিবর্তনশীল। সমাজের এই নিত্য পরিবর্তনশীলতার সাথে সাথে মানুষের জীবনধারা, চিন্তা-চেতনা,কৃষ্টি-সভ্যতাসহ সব কিছুই ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন কাঠামোর পরিবর্তন ও সেই সাথে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। আধুনিক বিশ্বে রাষ্ট্রের ভূমিকা সাবেকী 'পুলিশী রাষ্ট্র' থেকে 'কল্যান রাষ্ট্রে' পরিনত হয়েছে। রাজনীতির চরিত্রও হয়েছে উন্নয়নমূখী। উন্নয়নমূখী রাজনীতি আজ কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়নের প্রতিই বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে তাদের প্রথম সুর গনতন্ত্রায়ন, এবং দ্বিতীয় সুরটিই হলো উন্নয়ন [১]। অর্থাৎ আধুনিক রাজনীতির সংজ্ঞা তৃতীয় বিশ্বে আজ নুতন করে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। এখানে এখন রাজনীতির উদ্দেশ্য হলো পরিপূর্ন গনতান্ত্রয়ায়ন ও উন্নয়ন । তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর জন্য এটি আরো চরমসত্য হয়ে দেখা দিয়েছে, কেননা তৃতীয় বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশই চরম দারিদ্র প্রকৃতির ও অতিমাত্রায় গ্রামীন। তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দেশ হিসাবে সরকার দারিদ্রতা ও বেকারত্ব দূরীকরনে আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহন করেছে [২]। উন্নয়নশীলদেশের রাজনীতিতে কৌশল নির্ধারনে কৃষি উন্নয়নের দিকেই বেশী দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হচ্ছে। এসব দেশের উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে আর একটি দিক হলো গ্রামীন উন্নয়ন কর্মসূচী [৩]। মূলতঃ গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে এসব দেশে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালানো হয় । এসব দেশে উন্নয়ন বলতে মূলতঃ এই দু'য়ের সমষ্টিকেই বুঝায়। সরকারই এসব দেশের উন্নয়নের প্রধান অংশীদার এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারগুলোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশ নিয়ে থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ও সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃতীয় বিশ্বের এসব দেশগুলো আমলাতন্ত্রের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল [৪]। তবে উপনিবেশিক শাসনের মন-মানসিকতায় গড়ে উঠা আমলাতন্ত্রের সদস্যদের মাধ্যমে এসব দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম শুধু বারবার বাধাগ্রস্থই হয়েছে। এই প্রসংঙ্গে বলা যায় যে, আমলাতন্ত্রের বর্তমান কাঠামোগত রূপ দিয়ে উন্নয়ন ক্ষেত্রে কোন আশাব্যাঞ্জক ফলাফল আশা করা যায় না [৫]। এক্ষেত্রে জনগনের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততায় ও অংশগ্রহনে গড়ে উঠা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাই গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সংবিধান ও আইনের মাধ্যমে গড়ে উঠা স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন ইউনিট হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদগুলো হতে পারে উন্নয়নের প্রধান অংশীদার। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সেখানে স্থানীয় সরকারসমূহ এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে চলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

এটি সাধারনভাবে স্বীকৃত যে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকায়সমূহ গনতন্ত্র শিক্ষাকেন্দ্র [৬]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে স্থানীয় স্বায়ওশাসিত সরকারগুলো শুধু মাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, বরঞ্চ অর্থনৈতিক উন্নয়নেও অবদান রেখে চলেছে[৭]।

উন্নয়নশীল দেশে যেসব সাধারন সমস্যা বিদ্যমান বাংলাদেশ তার থেকে মোটেও বাইরে নয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক,রাজনৈতিক, ইতিহাস-ঐতিহ্যর সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের অপরাপর দেশের সাদৃশ্য রয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশে সরকারই সামাজিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান দিক নির্দেশক [৮]। বাংলাদেশের প্রশাসনিক ইউনিটের সর্বোচ্চ স্তরে আছে জেলা প্রশাসন। একজন জেলা প্রশাসক (ডি.সি) এর প্রধান কর্মকর্তা। এর নিচে রয়েছে থানা প্রশাসন, যার প্রধান হচ্ছেন থানা নির্বাহী কর্মকর্তা (টি.এন.ও)। বর্তমানে থানাকে ভেঙ্গে উপজেলা গঠন করায় আইন পুনরায় সংসদে (১৯৯৮) পাস হয়েছে [৯]। থানার নিচে প্রত্যেক ইউনিয়নে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ। এই ইউনিয়ন পরিষদই বর্তমানে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন প্রশাসনিক ইউনিট। সরকার তার উন্নয়ন পরিকল্পনাতে ইউনিয়ন কেন্দ্রীক বিভিন্ন কর্মসূচীর সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বদ্ধপরিকর। সরকারী উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে ইউনিয়ন কেন্দ্রীক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারনা দিনদিন শক্তিশালী হচ্ছে। বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার হিসাবে কাজ করার জন্য এইসব ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ বলে গঠিত [১০]। সীমিত সম্পদ ও ক্ষমতা নিয়েও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদগুলো উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। সুষ্ঠু পরিকল্পনাভিত্তিক ব্যবস্থা নিলে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ইউনিয়ন পরিষদ হতে পারে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলা যেতে পারে শক্তিশালী অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। যেহেতু, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগন সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন ও ফলাফল ভোগের সুযোগ পেয়ে থাকেন, সেহেতু সুষ্ঠু অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিকাশে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ এদেশে বিপুল অবদান রাখতে পারবে।

গবেষনার উদ্দেশ্য সমূহ

বাংলাদেশের মূল সমস্যা মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা। এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদ বিপুল অবদান রাখতে পারে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমেই রাজনীতিতে জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা যায় এবং সরকারী উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে স্থানীয়ভাবে সরাসরি অংশ নেয়া সহজতর হয়। সেহেতু সমগ্র দেশের স্থানীয় পর্যায়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমেই করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র গবেষনার মাধ্যমে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদের সমস্যাসমূহ সাধারনভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের কি ভূমিকা হতে পারে সেটি যথাসম্ভব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া অত্র গবেষনা কর্মের উদ্দেশ্য হলো-

ক) বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায়গুলো নির্ধারন করা।

খ) নির্ধারিত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরন।

গ) ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জনের উপায় নির্ধারন করা।

ঘ) সরকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধাসমূহ নির্নয় করা ও এসব বাধাসমূহ অপসারনের জন্য কৌশল নির্ধারন করা।

ঙ) ইউনিয়ন পর্যায়ে উৎপাদিত স্থানীয় কৃষি ও কুটির শিল্পের বাজারজাতকরনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরন এবং চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারন করা।

চ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিতকরন এবং যতদুর সম্ভব এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করা।

গবেষনার উদ্দেশ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এর মাধ্যমে শুধুমাত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার উপায়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না বরঞ্চ সেই সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশগ্রহনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সর্ম্পকে সম্যক ধারনা লাভ করা সম্ভব হবে।

গবেষনা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষনার উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষন করার কাজে শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ ও সরকারী দলিলাদিব উপর নির্ভরশীল না থেকে গবেষনামূলক কাজ চালানোর স্বীকৃত বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন ঃ মাঠজরীপ, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার গ্রহন ইত্যাদি স্বীকৃত পন্থার সাহায্য নেয়া হয়েছে।মাঠ জরিপের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যকলাপ সর্ম্পকে সম্যক ধারনা লাভ করা গেছে। বাংলাদেশের গ্রামীন অর্থনীতির প্রকৃতি বিশ্লেষন করতে এখানে অর্থনীতির অনেক জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ তুলে ধরতে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধিমালা, সরকারী প্রজ্ঞাপন ইত্যাদির উল্লেখ করা হয়েছে। ইউনিয়ন

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের ক্ষমতার ব্যপ্তি, সীমাবদ্ধতা তুলে ধরতে এসব আইন-কানুনের সম্পর্কে সম্যক ধারনা দেয়া হয়েছে এবং এসব আইন প্রনয়নের উদ্দেশ্য ও এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রন, আমলাতন্ত্রের সদস্যদের মনোভাব ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদকেন্দ্রীক উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারে বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষা করা হয়েছে। ইউনিয়নকেন্দ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভবনাসমূহ খতিয়ে দেখা হয়েছে।

অত্র গবেষনা কাজে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানাধীন ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের ১১৫ জন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে [১১]। তিন জন সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান [১২] এবং সাত জন সাবেক মেম্বারের সাক্ষাৎকারও এতে গ্রহন করা হয়েছে। মধুখালী থানা ফরিদপুর জেলা সদর থেকে ১২ কিলোমিটার [১৩] দূরে এবং রাজধানী ঢাকা থেকে এর দুরত্ব কম-বেশী ১৫৭ কিলোমিটার [১৪] মধুখালীর থানার আয়তন ২৩০ বর্গকিলোমিটার [১৫]। অত্র গবেষনা ক্ষেত্রের সঙ্গে বাংলাদেশের অপরাপর সমভূমি অঞ্চলের মিল রয়েছে। বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষনা সংস্থা কর্তৃক (স্পারসো) ভূপৃষ্ঠের বাইরে মহাশূন্য অবস্থানকারী কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত মধুখালী থানার ''স্পট ম্যাপ''অনুযায়ী দেখা যায় যে, এই থানা এলাকার সাথে বাংলাদেশের সাধারন ভূ-প্রকৃতিগত মিল রয়েছে [১৬]। অত্র গবেষনাকর্মে ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানাধীন ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা মূলতঃ নমুনায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, থানা-ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, কলেজ ও স্কুল শিক্ষকবৃন্দ এবং পেশাজীবি বিভিন্ন গ্রুপ নমুনায়নের জন্য ব্যবহৃত হয়েছেন। গবেষনাকর্মে মাঠ পর্যায়ে তথ্যানুসন্ধান কাজ করা হয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহন পর্বে মধুখালী থানাধীন ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের মোট ১১৫ জন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ৬৮ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। সমগ্র সাক্ষাৎকার পর্বটি ব্যক্তিগতভাবে চারটি পর্যায়ে গ্রহন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে মধুখালী থানাধীন ৯টি ইউনিয়নসমূহের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের, দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে গ্রহন করা হয়েছে সাধারন কৃষকদের সাক্ষাৎকার এবং সর্বশেষ চতুর্থ পর্যায়ে গ্রহন করা হয়েছে বিভিন্ন পেশাজীবি ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকার। আশা করেছিলাম যে, মধুখালী থানাধীন নয়টি ইউনিয়ন পরিষদের সব চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা যাবে। কিন্তু সাক্ষাৎকার গ্রহনকালে দুইজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সাত জন নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার, তিন জন নির্বাচিত মহিলা সদস্যাকে সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে পাওয়া যায় নাই। ভুমাইন ইউনিয়ন পরিষদে যেয়ে চেয়ারম্যান সাহেবকে পাওয়া যায় নাই। তিনি মধুখালী থানার বাইরে ব্যক্তিগত সফরে ছিলেন। মধুখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কোন এক অজানা কারনে সাক্ষাৎকার প্রদানে

Dhaka University Institutional Repository

অপরাগতা প্রকাশ করেন। আমি কয়েকবার ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করে এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনুরোধ করেও বিফল মনোরথ হই। পরে এর কারন অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে, তিনি মানসিক উৎকণ্ঠায় সাক্ষাৎকার দেননি। সাক্ষাৎকার পর্বের শেষ সময়েও (জুন, ১৯৯৯) বেশ কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যকে না পাওয়াতে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা সম্ভব হয় নাই। সরকার উপজেলা পদ্ধতি পুনঃপ্রর্বতনের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছেন [১৭] তাতে ১৯৯৯ সালে উপজেলা নির্বাচন হবার কথা। উপজেলা নির্বাচনকে সামনে রেখে উপজেলা নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থীরা আগাম প্রচারনায় নেমে পড়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দের ব্যস্ততা সে কারনেই বেড়ে গিয়েছে বলে জানতে পেরেছি। একারনে এদের সাক্ষাৎকার নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের সাক্ষাৎকার গ্রহন অত্র গবেষনাকর্মে অপরিহার্য ছিল। কেননা, এদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের সামগ্রিক কর্মকান্ডে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। এসব চেয়ারম্যান-মেম্বারদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে এসব ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্ষমতার নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে [১৮]।

বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কৃষিখাত থেকে আসে [১৯] এবং এদেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার শতকরা ৬৯.৬ ভাগ কৃষিখাতের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল [২০]। এ লক্ষ্যে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারনে কৃষিখাতের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কৃষি উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদকেন্দ্রীক কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সব বাস্তব সমস্যা রয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের মতামত নেয়া হয়েছে। মধুখালী থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের মোট ৬৮ জন কৃষকের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। কৃষক সমাজের প্রকৃত অবস্থা নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরতে এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহনকরা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকার পর্বে ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক, মাঝারী কৃষক, এবং অবস্থা সম্পন্ন ধনী কৃষকের কাছে যাওয়া হয়েছে এবং অত্যন্ত সর্তকতার সাথে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহন করা হয়েছে। কৃষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব সর্তকতা গ্রহন করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষের কাছ থেকে ওয়াকেবহাল হয়ে বিশেষ করে কৃষকদের ভূমির পরিমান ও অর্থনৈতিক অবস্থা জিজ্ঞাসা করে ও যাচাই করে তাদের ননুনায়নের জন্য বাছাই করা হয়েছে।

বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা বা এন,জি,ও (নন্ গর্ভমেন্ট অর্গানাইজেশন) কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও সচেষ্ট রয়েছেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে এদের অবদানকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নাই বরঞ্চ দেখা গেছে যে, মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে এরা সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। এ কারনে সরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের. পাশাপাশি এলাকায় অবস্থানরত এন,জি,ও কর্মচারী-কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রদত্ত তথ্য গুরুত্বের সাথে গ্রহন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এ সব সাক্ষাৎকার পর্বে সংক্ষিপ্ত ও নৈব্যক্তিক ধরনের প্রশ্নের সাহায্য নেয়া হয়েছে [২১]। নির্বাচিত প্রশ্নসমূহ পূর্বেই পরীক্ষাপূর্বক যাচাই করে নেয়া হয়েছিলো। যাচাইয়ের পর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতে এতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে। আসলেই ডাটা বা তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটাই পর্যবেক্ষন। এ প্রক্রিয়ার সাফল্য অংশগ্রহনকারী ও পর্যবেক্ষনকারীর পারস্পরিক সমঝোতার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। এই সাক্ষাৎকার গ্রহনপর্বে যথার্থ তথ্য পাবার উদ্দেশ্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদানকারীর জমির প্রকৃত পরিমান, আয়, দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ে সংশিষ্ট এলাকার ওয়াকেবহাল ব্যক্তিদের সাহায্য নেয়া হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাবলী যাচাই করে নেয়া হয়েছে।

মধুখালী থানা আমার কাছে নতুন কোন জায়গা নয়। বিগত ১৯৯৮ সালে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে, '' ফরিদপুর পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা '' শীর্ষক এক গবেষনা দলের অর্ন্তভূক্ত হয়ে আমি মধুখালীতে গিয়েছিলাম [২২]। এছাড়া আমার কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি উক্ত এলাকায় দীর্ঘ দিন ধরে বসবাস করছেন। তারা আমাকে সবার সঙ্গে পরিচিত হতে যথেষ্ট সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন। অনেকে আমার কাছে আমার এই সাক্ষাৎকার কার্যক্রমের কারন জানতে চাওয়ায় তাদের বুঝিয়ে বলেছি যে, আমার উদ্দেশ্য গবেষনা কাজের জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। এতে আপনাদের কোন ক্ষতি হবে না, বরঞ্চ এসব তথ্য পেলে ব্যক্তিগতভাবে আমার লাভ হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম,ফিল ডিগ্রী প্রাপ্তির লক্ষ্যেই আমার এই প্রচেষ্টা। আমি দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া সবারই আকুঠ সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছি। কয়েকজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কয়েকটি ইউনিয়ন পরিষদের সভার নিয়মিত কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করেছি।

অধ্যায় উপস্থাপন পরিকল্পনা

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে গবেষনা পরিকল্পনা, গবেষনার উদ্দেশ্যসমূহ, গবেষনা পদ্ধতি এবং অধ্যায় বিন্যাস পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ তুলে ধরা হয়েছে। এ অধ্যায়ে প্রাক-ইংরেজ আমল, ইংরেজ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমলের হালনাগাদ বিভিন্ন আইন-কানুন তুলে ধরা হয়েছে। এ সব আইন-কানুনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের মাধ্যমে আমরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করতে পেরেছি কেননা , বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারের ইতিহাস না জানলে এবং এর প্রকৃত সমস্যা না বুঝলে সমাধানদান প্রক্রিয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। ইংরেজপূর্ব সময়ের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কেও ধারনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া এই অধ্যায়ে আমরা স্থানীয় সরকারের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে সরকার গৃহীত সিদ্ধান্তবলী তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এই অধ্যায়ের বিষয়াবলীকে চারটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা ও বিশ্লেষন করা হয়েছে। এই চারটি ভাগ হলো , ১। প্রাক-ইংরেজ আমল,২। ইংরেজ আমল, ৩। পাকিস্তান আমল ও ৪। বাংলাদেশ আমল।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের অনগ্রসর গ্রামীন অর্থনীতির প্রকৃতি ও সরকারী উন্নয়ন কৌশলসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এতে সাধারন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অনগ্রসরতার কারনগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকার গৃহিত বিভিন্ন কর্মকান্ড ও কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে ইউনিয়ন কেন্দ্রীক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এসব সমস্যা দূরীকরনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন কেন্দ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাধনাসমূহ এখানে তুলে ধরা হয়েছে সেই সাথে গবেষনায় প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষন করা হয়েছে।

সর্বশেষ, পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা সমূহ তুলে ধরা হয়েছে।

পাদটীকা

(১) দেখুন,A.H.M. Aminur Rahman , Politics of Rural Local Self-goverment in Bangladesh, (Dhaka: University of Dhaka, 1990), পৃষ্ঠা-৪।

(২) দেখুন,Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh-1997, (Dhaka: Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা-৩৭।

(৩) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪।

(৪) দেখুন,Joseph La Palombara, "An Overveiw of Bureaucracy & Political Development", তার সম্পাদিত বই, Bureaucracy & Political Development,(New Jersey: Princeton University Press, 1963), পৃষ্ঠা-৩-৩৩।

(৫) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫।

(৬) দেখুন, Ursula K.Hicks, Development from Below: Local Government & Finance in Developing Countries of the Commonwealth (Oxford: Clarendon Press, 1961), পৃষ্ঠা- ১-৯।

(৭) দেখুন, Ursula K.Hicks, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১-৯।

(৮) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯।

(৯) দেখুন,উপজেলা আইন - ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

(১০) দেখুন, The Local Government (Union Parishad) Ordinance –1983, (Ordinance No –51 of 1983), Bangladesh Gazette, Extra-ordinary, 12 September, 1983.

(১১) পরিশিষ্ট-ক(১) দেখুন।

(১২) পরিশিষ্ট-ক(১) দেখুন।

(১৩) ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য ।

(১৪) বি,আর,টি,সি কর্তৃক প্রকাশিত দূরত্ব সম্পর্কিত তালিকা থেকে প্রাপ্ত।

(১৫) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh-1997, (Dhaka: Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা- ১২০।

(১৬) দেখুন,বাংলাদেশ দূর অনুধাবন ও মহাকাশ গবেষনা সংস্থা (স্পারসো) কর্তৃক প্রকাশিত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তোলা মধুখালী থানার মানচিত্র।

(১৭) দেখুন, উপজেলা আইন - ১৯৯৮।

(১৮) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ১৪।

(১৯) বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের অবদান ২৯.৮ ভাগ (১৯৯৬-১৯৯৭), দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh-1997, (Dhaka: Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা-২৭৮।

(২০) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh-1997, (Dhaka: Bureau of Statistics, January, 1998),পৃষ্ঠা- ১৭১,আরো দেখুন, Report on Labour Force Survey in Bangladesh- 1995-1996 .

(২১) পরিশিষ্ট -খ দেখুন।

(২২) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের উদ্যোগে ও কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডোনার এজেন্সি (সিডা)'র সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ''ফরিদপুর পৌর এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা'' নির্ণয়ের জন্য গঠিত গবেষনা দলের উদ্যোগে এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সৈয়দ শফিউল্লাহর নেতৃত্বে গঠিত গবেষনা দলে গবেষক জন সংযোগ কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-২

বাংলাদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ক্রমবিকাশের ইতিহাস

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা ও কর্মদক্ষতা, এসব প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, আয়, নেতৃত্বের দক্ষতা, পারদর্শিতা ও এ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। অতীত থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষমতাসীন সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসুচী সমূহ এক্ষেত্রে পুংখানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষনের দাবীদার। পুর্বের এসব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত কর্তৃপক্ষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারবো যে, কি প্রক্রিয়ায় কেমন করে ও কিসের ভিত্তিতে তৎকালীন সময়ে এ সকল গ্রাম্য স্থানীয় পরিষদসমূহের স্বতর্যুত আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, এসব গ্রাম্য স্থানীয় স্বশাসিত পরিষদের কাজ কেমন ধরনের ছিল, তাদের ক্ষমতা ও অর্থ প্রাপ্তির উৎস কোথায় ছিল, এবং সর্বোপরি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এসকল গ্রাম্য স্থানীয় স্বশাসিত পরিষদের সম্পর্ক কেমন ছিল। পুর্বের এসব স্থানীয় পরিষদের অতীত ইতিহাস বিশ্লেষন করলে আমরা দেখতে পাই যে, স্বতর্যুতভাবে গড়ে উঠা এসব স্থানীয় পরিষদসমূহের বেশীরভাগ পরিষদই নিজেদের এলাকার অভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতো। এসব পরিষদ গ্রামে শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেন। গ্রামবাসীদের মধ্যকার ছোট-খাট বিরোধের মীমাংসা করতেন, গ্রামীন মানুষকে স্থানীয় স্ব-শাসিত পরিষদের কাজে ক্রমান্বয়ে আগ্রহশীল করে তুলতেন[১]।

বাংলাদেশের স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকার সম্পর্কে ভালভাবে বুঝতে এবং এসম্পর্কে ধারনা লাভের জন্য এখানে সরকার প্রবর্তিত আনুসঙ্গিক বিভিন্ন আইন-অধ্যাদেশ, ঘোষনা, বিধি-বিধান এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্পর্কে সরকার নিধারিত বিভিন্ন কমিটির সুপারিশমালা সমূহ যথাসম্ভব আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বর্নিত ও আলোচিত আইন ও অধ্যাদেশসমূহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের উন্মেষ, কার্যক্রম, ক্ষমতায় ব্যপ্তি সম্পর্কে আমাদের জানতে সহায়তা করবে ও অনেক ক্ষেত্রে ত্রটি বিভিন্ন শাসনামলের সময় বিভিন্ন আঙ্গিকে ও নামে গঠিত স্থানীয় সংস্থার হঠাৎ লোপপ্রাপ্তির কারন জানার জন্য অনেকাংশে সহায়ক হবে । তবে এসব আইন প্রনয়নের পেছনে উদ্দেশ্য যাইহোক, এইসব আইনকানুনসমূহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে বিধিবদ্ধভাবে তার প্রাথমিক অবকাঠামো গঠন ও বিকাশে সহায়তা করেছে। তাছাড়া সরকার প্রনীত এসব আইন-কানুন, বিধি-বিধান সমূহ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সমূহকে তাদের কাজের গতি-প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে নির্ধারন করে দিয়েছে এবং এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের দায়িত্ব-কর্তব্যর সীমারেখা নির্ধারন করে দিয়েছে। একথা প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে, আইনগত অবকাঠামো গঠন ব্যতিত আরো অনেক বিষয়াবলী স্থানীয় সংস্থার কাজ, ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন

Dhaka University Institutional Repository

প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলেছে। এ সবের মধ্যে রয়েছে হঠাৎ উদ্ভুত পরিস্থিতি, স্থানীয় সরকারের কার্যক্রমে মানুষের অভিজ্ঞতা, স্থানীয় নেতৃত্বের নেতৃত্ব দানকারী শক্তির প্রভাব, স্থানীয় মানুষের দক্ষতা ও সম্পদের প্রভাব,পরিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মত পরিস্থিতি, মানুষের সরকারী কাজে অংশগ্রহনের আগ্রহ বা প্রবনতা এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের পরিবর্তিত চিন্তা-ধারা ইত্যাদি।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ তুলে ধরতে আলোচনার সুবিধার্থে প্রাক-ইংরেজ আমল থেকে বর্তমান বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত সময়কালকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হল- (১) প্রাক-ইংরেজ আমল, (২) ইংরেজ আমল (৩) পাকিস্তান আমল এবং (৪) বাংলাদেশ আমল।

প্রাক ইংরেজ আমল

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের ধারনা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে নতুন নয়। সুদূর অতীতকাল থেকেই এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। আজ পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক, গবেষক কিংবা সমালোচক প্রাচীন ভারতে সুশৃংখলভাবে গড়ে উঠা ''গ্রাম পঞ্চায়েত'' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই [২]। এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতীয় সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য প্রথা হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে [৩]। কবে, কখন এবং কোথায় এই আদি গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়েছে সে সম্পর্কে কোন সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। তবে এ যাবৎ প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমভিত্তিক একটি সক্রিয় ব্যবস্থা হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল [৪]। এই আদি গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামের প্রবীন ও সম্মানীয় লোকদের নিয়ে (গ্রামের জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে) এক অনানুষ্ঠানিক নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হত।

প্রাচীন ভারতের গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এই উন্নতরুপ সম্পর্কে চার্লস ম্যাকফস্ মন্তব্য করেছেন-''এই সব প্রাচীন গ্রাম্যসমাজ ছিল এক একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র। এরা নিজেদের প্রাত্যহিক চাহিদা পুরনে নিজেরাই মোটামুটিভাবে সক্ষম ছিল এবং (রাজনৈতিক ক্ষেত্রে) বৈদেশিক সংশ্রব বর্জিত থেকে রাজনৈতিক ভাবে প্রায়স্বাধীনতা ভোগ করতো। এসব গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যুগের পর যুগ অবলোকন করেছে, এক রাজবংশের পর আরেক রাজবংশের ক্ষমতা আরোহনের সংগ্রাম ও উত্থান-পতন দেখেছে। রাজবিদ্রোহী জনতার বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব দেখেছে। প্রাচীন ভারতের এই সব সনাতন গ্রাম্যসমাজ একতাবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য ছোট রাজ্য গঠন করেছে মূলতঃ বিপ্লব-প্রতিবিপ্লব থেকে সাধারন মানুষদের বাচাঁতে এবং রাজা-রাজন্যদের দ্বারা সৃষ্ট বড়

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পেতে। সর্বোপরি সকলের স্বাধীনতা ও অধিকারকে সুরক্ষার বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে'' [৫]।

সাধারনভাবে এ কথা মনে করা হয় যে, প্রাচীন গ্রাম পঞ্চায়েতসমূহ গ্রামের পাঁচ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্বনয়ে গঠিত হত [৬]। স্বভাবতঃই গ্রামপ্রধানই এখানে গুরুত্বপূর্ন দায়িত্ব পেতেন। এখানে অনুমান করা হয় যে, একটি সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রামের শান্তি-শৃংখলা রক্ষা করতেন এবং গ্রামের মানুষদের ছোট-খাট বিবাদ-বিসংবাদি মিমাংসা করতেন। গ্রামের বিশিষ্ট বয়োঃজ্যেষ্টরা গ্রামীন সমাজে সংগঠিত ছোট-খাটো বিবাদ- বিসংবাদ সালিশের মাধ্যমে নিস্পত্তি করতেন। কিন্তু এই গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কোন সুনির্দ্দিষ্ট গঠন কাঠামো তখন পর্যন্ত গড়ে উঠে নাই। এ সব গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নিয়মিত কার্যবিবরনী সর্ম্পকিত কোন প্রামান্য ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আজ পর্যন্ত সুর্নিদিষ্টভাবে পাওয়া যায় নাই। উপরে বর্নিত এসব তথ্যাবলী ইংরেজ শাসনামলে দিনাজপুরের বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে রিপোর্ট আকারে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এবং অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সর্ম্পকিত আরো বহু তথ্যাবলী এখনো সেখান থেকে লাভ করা যাবে [৭]।

মুঘল শাসনামলে তৎকালীন সুবে বাংলার শাসন পদ্ধতিও কোন সুনির্দিষ্ট গঠন কাঠামোর আওতায় ছিলনা এবং এসময়ের শাসন পদ্ধতি কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ দ্বন্ধর্পূন। একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, মুঘল সংস্কার কর্মসূচীসমূহ একমাত্র শেরশাহের সময়কাল ব্যতিত কখনোই উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ তৎকালীন বঙ্গীয় প্রদেশ বা সুবা বাংলায় কার্যকরী হয় নাই [৮]। প্রাক ইংরেজ আমলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো ছিল অদ্ভুত ধরনের এবং তৎকালীন সময়ে বাংলাদেশে স্থানীয়ভাবে বেশীরভাগ চাষযোগ্য জমির উপর নিয়ন্ত্রন কর্তৃত্ব ছিল ভূ-স্বামীদের উপর। এরাই রাজস্ব আদায় ও শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূন ভূমিকা পালন করতেন [৯]। এক সময়ে বিত্তশালী-প্রতাপশালী এসব ভূ-স্বামীদের মধ্যে থেকে একটি অংশ স্বতফুর্তভাবে স্বীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব নেয়া শুরু করলেন।

ইংরেজ আমল

ব্রিটিশ ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে শাসনভার পড়বার পর হতে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যপক পরিবর্তন আসে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট পরিবর্তনের ফলে বিদ্যমান প্রাচীন স্থানীয় সরকার কাঠামোর উপর ব্যপক প্রভাব পড়ে। এক ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা, যেটি অবিভক্ত বাংলার সুদুর অতীতকাল থেকে আপন মহিমায় ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করেছিলো সেটি আর কোম্পানীর দীর্ঘ ১০০ বছরের শাসন কালের মধ্যে (১৭৫৭ খ্রীঃ-

Dhaka University Institutional Repository

১৮৫৮ খ্রীঃ)মোটেও বিস্তৃতি ও প্রসার লাভ করতে পারে নাই। বরঞ্চ ইংরেজ প্রবর্তিত পদ্ধতির ফলে প্রাচীন এসব গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল [১০]।

বৃটিশদের সৃষ্ট জমিদারী ব্যবস্থা, যা মূলতঃ খাজনা আদায়ের নি-চয়তার আড়ালে বৃটিশ শাসনের সুবিধার্থে ও রাজনৈতিক কারনে এদেশে বৃটিশদের অনুগত তাবেদার দেশীয় শ্রেনী তৈরির জন্য চালু করা হয়েছিলো, সেটি পুরানো পঞ্চায়েত ব্যবস্থার স্থলে প্রতিস্থাপিত হলো। বৃটিশসৃষ্ট নব্যপ্রতিষ্ঠিত এই সব জমিদারেরা প্রথম থেকেই তাদের স্ব-স্ব জমিদারী এলাকায় বিদ্যমান এসব সনাতন স্থানীয় সরকারের প্রভাব-প্রতিপত্তি উপলব্ধি করতে পারলেন এবং এসব সনাতনী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা স্ব-স্ব জমিদারী এলাকায় চালু থাকলে তারা স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচন্ড বাধার সম্মুখীন হবেন সেকথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন। প্রাচীন গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা যে জমিদারদের অত্যাচার ও অবৈধ ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করবে এ কথা বুঝতে পেরেই বৃটিশ উদ্ভাবিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে সৃষ্টি নব্য প্রতিষ্ঠিত জমিদারশ্রেনী এই প্রাচীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সমূলে বিনাসের জন্য উদ্যোগী হয়। স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসব জমিদারেরা সনাতন গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মধ্যে সুকৌশলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে শুরু করেন। ফলশ্রুতিতে, সাধারন গ্রামীন জীবন দ্বন্দ-সংঘাত ও পারস্পরিক আস্থাহীনতায় দুর্বিসহ হয়ে উঠতে লাগলো। গ্রামীন জীবনধারা আইনকে অশ্রদ্ধা করতে শিখলো ও মানুষের মধ্যে আক্রমনাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হতে লাগলো। বৃটিশ সরকারের প্রতি সাধারন মানুষের মনোভাব হিংসাত্মক ও বিদ্বেষপূর্ন হয়ে উঠতে লাগলো। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ও বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তৎকালীন ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইংরেজ সরকার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনে তৎপর হলেন। গ্রামের শান্তি-শৃংখলা রক্ষাকল্পে স্থানীয় সংগঠনকে স্বীকৃতি দিয়ে ১৮৭০ সালে প্রনীত হয় ''গ্রাম্য চৌকিদারী আইন''। অন্যদিকে বিলুপ্তপ্রায় সনাতনী গ্রামীন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার শূন্যস্থান পুরন করার লক্ষ্যে ১৭৯৩ সালে ইংরেজ সরকার প্রতাপশালী জমিদারী ব্যবস্থা সৃষ্টি করলেন [১১]। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন ১৭৭৩ এর অধীনে স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে জমিদাররা ব্যর্থ হন [১২]। অন্যদিকে জমিদার শ্রেনীর উদ্ভবের পর হতে আরেক সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়, পূর্বে গ্রামের ধনী লোকেরা ব্যক্তি উদ্যোগে যেসব সমাজসেবামূলক কার্যাদি করতেন, জমিদারী প্রথা উদ্ভবের পর হতে এরকম জনকল্যানমূলক কাজের রেওয়াজ চিরতরে বিলুপ্ত হতে শুরু হল। যাইহোক, ১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌকিদারী আইন ছিল স্থানীয় গ্রামীন পর্যায়ের শান্তি-শৃংখলা, স্থিতিশীলতা রক্ষাকল্পে বৃটিশদের গৃহীত প্রথম পদক্ষেপ [১৩]।

১৮৭০ সালের গ্রাম্য চৌকিদারী আইন অনুসারে জেলা প্রশাসক কমপক্ষে পাঁচজন সদস্য নিয়ে গ্রাম ভিত্তিক '' চৌকিদারী পঞ্চায়েত'' নিয়োগ করতেন। এই চৌকিদারী পঞ্চায়েতের প্রধান কাজ ছিল গ্রাম্য চৌকিদারদের (পাহারাদার) জন্য চাঁদা আদায় করা। চৌকিদারী পঞ্চায়েতের সদস্যদের মনোনীত করা হতো। এই চৌকিদারী পঞ্চায়েতের যারা সদস্য মনোনীত হতেন তারা যদি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করতেন সেক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশ টাকা জরিমানা আদায় করার বিধান ছিল। এই চৌকিদারী পঞ্চায়েত গ্রামবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত কিংবা মনোনীত ছিলেন না, বরঞ্চ জেলা প্রশাসক অথবা জেলা প্রশাসকের অধীনস্থ কর্মকর্তাগনই চৌকিদারী পঞ্চায়েত নিয়োগ করতেন। জেলা প্রশাসক ইচ্ছা করলে এদের অপসারনও করতে পারতেন। চৌকিদারী পঞ্চায়েত কোন স্বেচ্ছাসেবী ব্যবস্থা ছিলনা এবং কেউই এর সদস্যপদ গ্রহন করতে অস্বীকার করতে পারত না। চৌকিদারী পঞ্চায়েতের প্রতিটি সদস্য গ্রামের যাবতীয় অপরাধের তথ্য পুলিশকে প্রদান করতে বাধ্য ছিলেন। চৌকিদারী পঞ্চায়েত গ্রামের শান্তি রক্ষার্থে চৌকিদার নিয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু জেলা প্রশাসকের সম্মতি ছাড়া তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন না। শুধুমাত্র অসদাচরণ ও কর্তব্য অবহেলা করলেই গ্রাম্য চৌকিদারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যেতো। চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তৎকালে অবিভক্ত বাংলার বেশ কয়েকটি জেলায় চালু ছিল। যাই হোক, তৎকালীন সময়ে স্থানীয়পর্যায়ে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের পাঠানো প্রতিবেদনদৃষ্টে সরকার উপলব্ধি করলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে চৌকিদারী পঞ্চায়েতের সৃষ্টি করা হয়েছিলো তার প্রয়োজন সরকারের শেষ হয়ে গেছে।

চৌকিদারী পঞ্চায়েত অকার্যকর হবার পিছনে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা ছিল [১৪] । উদাহরনস্বরূপ বলা যায়, চৌকিদারী খাজনা বা কর উঠানো হতো গ্রামবাসীর সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে, যা' কিনা সাধারন মানুষের কাছে ছিল অগ্রহনযোগ্য। এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বল দিক ছিল এর সদস্য মনোনয়ন পদ্ধতি এবং সদস্যপদ গ্রহনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা। এই গ্রাম্য চৌকিদারী ব্যবস্থা ছিল শাসক ও শাসিতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী ব্যবস্থা যা কিনা আদৌ জনসমর্থন লাভ করে নাই। এই গ্রাম্য চৌকিদারী ব্যবস্থা মূলতঃ চালু হয়েছিলো গ্রামের শান্তি-শৃংখলারক্ষা ও কর আদায়ে প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য। সমাজসেবা কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে স্থানীয়ভাবে এই ব্যবস্থাকে সম্পৃক্ত করা হয় নাই।

গ্রাম্য চৌকিদারী ব্যবস্থাকে যদি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে বৃটিশদের সৃষ্ট প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে অভিহিত করা হয় তবে তৎপরবর্তীকালে প্রনীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইন-১৮৮৫'কে অবিভক্ত বাংলার স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইনের অধীনে কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে ইউনিয়ন কমিটি গড়ে তোলা হয় মূলতঃ সামাজিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এসব সেবাখাতের মধ্যে ছিল রাস্তা তৈরী ও মেরামত, পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থার তদারকী, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি। একটি অনানুষ্ঠানিক নির্বাচনের মাধ্যমে কমপক্ষে পাঁচ থেকে নয়জন সদস্য সমন্বয়ে কমিটি গঠনের বিধানও এতে ছিল। স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের ইউনিয়ন কমিটি সমূহের কাজের অগ্রগতি তাদরকীর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল এবং জনস্বার্থের দোহাই দিয়ে সরকারী কর্মকর্তাগন ইউনিয়ন কমিটির উন্নয়নমূলক যে কোন কাজ স্থগিত বা বন্ধ করার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইন-১৮৮৫, নামে এই আইনটি ১৮৮২ সালের রিপনসের রেজুলেশনের প্রভাবে বহুলাংশে প্রভাবান্বিত হয়েছিলো বলে বলা হয়ে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

[১৫]। মূল আইনটি ১৮৮৫ সালে পাশ হবার প্রাক্কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছিলো। যদি লর্ড রিপনের রেজুলেশনকে এক্ষেত্রে মান নির্ণায়ক হিসাবে ধরা হয় তবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পরবর্তীতে প্রনীত ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার আইনটি মূলধারা থেকে অনেক দূরে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিলো। আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্য যে, ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার আইন তৎকালে বিকাশমান চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার (১৮৭০ সালের আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত) অস্তিত্ব ও কার্যক্রম সম্পর্কে নীরব ভূমিকা পালন করেছিলো। ফলশ্রুতিতে, গ্রামের শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দ্বায়িত্ব কিন্তু চৌকিদারী পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ন্যস্ত ছিলো, অন্যদিকে নব গঠিত ইউনিয়ন কমিটিও তাদের উপর অর্পিত বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল। মূলতঃ স্থানীয় এলাকায় এক ধরনের সমঝোতার ভিত্তিতে এই দুই ধরনের স্থানীয় শাসন কাঠামোই নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল।

নব প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন কমিটির হাতে অর্পিত সামান্য অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যেই সে তার উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। অতিরিক্ত দ্বায়িত্ব হিসাবে ইউনিয়ন কমিটিগুলো তৎকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠিত লোকাল বোর্ড কর্তৃক অর্পিত বিভিন্নমুখী দ্বায়িত্ব পালন করছিলো। তৎকালে লোকাল বোর্ডের ক্ষেত্রাধিকারের মধ্যে অবস্থিত ইউনিয়ন কমিটির সদস্যরা ''নির্বাচক মন্ডলী'' হিসাবে লোকাল বোর্ডের সদস্যদের নির্বাচিত করতেন। মূল আইনে ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান সম্পর্কে কোন উল্লেখ ছিলনা। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার সরকার ১৯০৮ সালে একটি সংশোধনী আনেন এবং পরে পূর্ব বংগের উপরও ১৯১৪ সাল হতে সংশোধনীটি কার্যকরী করা হয়। এতে বিধান রাখা হয় যে, প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটি তাদের সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান করবেন [১৬]। ১৮৮৫ সালের আইনের মূল দুর্বলতা হলো এটি ছিল অতিমাত্রায় আমলানির্ভর ও আমলাতন্ত্রের সদস্যদের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগক্ষেত্র। লর্ড রিপনের সময়ের রেজুলেশনের মর্মবানী আমলাদের কাছে মোটেও গ্রহনযোগ্য হয় নাই মূলতঃ তাদের আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কারনে [১৭]। এসব কারনে লর্ড রিপনের রেজুলেশন কার্যকরী হতে পারে নাই।

১৮৮৩ সালের খসড়া আইন বা বিলের সময় অবিভক্ত বাংলার আনাচে-কানাচে গড়ে উঠা ইউনিয়ন কমিটিগুলো চৌকিদারী পঞ্চায়েতের চেয়েও জনমনে কম প্রভাব ফেলে ছিলো। যেসব ইউনিয়ন কমিটি ১৮৮৩ সালের খসড়া আইন বা বিলের সময় গঠিত হয়েছিল, এদের অনেকের অস্তিত্বই ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার আইন পাশের পর খুঁজে পাওয়া যায় নাই [১৮]।

১৮৮৯ সালে গ্রামের স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নের জন্য ইউনিয়ন কমিটিকে নিয়োগ করার ব্যাপারে কথা উঠেছিল, কিন্তু এ ব্যাপারে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত কোন বাস্তব কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই।

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার আইন লর্ড রিপনের সংস্কার প্রস্তাব দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রানিত হয়। এই আইন মোতাবেক স্থানীয় সংস্থাকে (লোকাল বডি) তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল, যথা- ক) জেলাবোর্ড খ) লোকাল বোর্ড, এবং গ) ইউনিয়ন কমিটি।

সর্বনিম্ন পর্যায়ের স্থানীয় সংস্থা ইউনিয়ন কমিটি কতোগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। ইউনিয়ন কমিটিগুলো সাধারনতঃ স্থানীয় স্কুল, পুকুর, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মান ও সংস্কার কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। অন্যদিকে গ্রাম্য শান্তি-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব চৌকিদার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর ন্যস্ত ছিল।

এই ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি ছিল এতে ইউনিয়ন কর্মিটগুলোর হাতে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ছিলনা। ইউনিয়ন কমিটিগুলো জেলা বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতো। লোকাল বোর্ডও অনেকটা অনুরুপ ভূমিকা পালন করতো।

স্থানীয় সরকারের কার্য-ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করার জন্য বৃটিশ সরকার জেলা প্রশাসনিক কমিটি গঠন করেন। বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই কমিটি ১৯১২-১৩ সালে তাদের সুপারিশমালা ব্যক্ত করেন। প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি জেলা বোর্ডের উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা অর্পন এবং লোকাল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডকে জেলা বোর্ডের দয়া-দাক্ষিন্যর উপর প্রতিষ্ঠিত করার নীতির বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। কমিটি স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় নিম্নপরিষদগুলোকে উচ্চ পরিষদ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে মত প্রকাশ করেন।

লর্ড রিপনের সংস্কারের ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ব্যাপক অংশগ্রহনের মাধ্যমে মানুষের রাজনৈতিক চেতনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। অনেক ভারতীয় নেতৃবৃন্দ একে অভিনন্দন জানান। আইন পরিষদের অনেক নামজাদা সদস্য তাদের প্রারম্ভিক রাজনৈতিক জীবন এই সমস্ত সংস্থা হতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তীকালে জাতীয় রাজনীতিতে খ্যাতি অর্জন করেন। তবে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে এর অব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট ক্ষোভও বিদ্যমান ছিল। ইংরেজ আমলে তৎকালীন ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবিগন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ব্যবস্থায় বেসরকারী সদস্যদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌন এবং তাদের অনেকে একে দেশীয় তাবেদার শ্রেনী তৈরির সূতীকাগার হিসাবেও আখ্যায়িত করতে থাকেন। তবে সকল সমালোচনার মুখেও পরবর্তী প্রায় ৩০ বছর সময়কাল পর্যন্ত এই পদ্ধতির আওতায় ইউনিয়ন কমিটিতে মনোনীত সরকারী সদস্যদের অপ্রতিহত প্রভাব-প্রতিপত্তি বিদ্যমান ছিল। ১৯০৭ সালে ভারত সরকার কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সম্পর্ক নিরুপনের জন্য এবং শাসন ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রী-করন নীতি কার্যকর করার জন্য হবস্ হাউজ এর নেতৃত্বে একটি রাজকীয় কমিশন গঠন করেন [১৯]। ১৯০৯ সালে এই কমিশন সরকারের কাছে তাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। তবে কমিশনের রিপোর্টে ভারতীয় জনগনের আশা-আকাঙ্খার যথাযথ প্রতিফলন ঘটে নাই। কমিশন সুপারিশ করেন যে, জেলা বোর্ডের সভাপতি হিসাবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বহাল থাকবেন। তবে রিপোর্টটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত হবার পরও সুপারিশ সমূহ কার্যকর করার জন্য তুরিৎ ব্যবস্থা গ্রহন করার পদক্ষেপ নেয়া হয় নাই।

পরবর্ত্তীতে মন্টেগু ও তার নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষের শাসন পদ্ধতির সংস্কারের লক্ষ্যে এবং এ ব্যাপারে বাস্তব ধারনা লাভ করার জন্য ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচের বিভিন্ন জায়গায় ৮ মাস সময়কাল কাটান এবং এ সর্ম্পকিত বিভিন্ন জনের মতামত নেন। মন্টেগু এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ড মিলে এসব সমস্যা চিহ্নিতকরন ও তার সমাধানের উপায় নির্ধারন করে চূড়ান্ত রির্পোট বা প্রতিবেদন তৈরি করেন। এই রির্পোট ১৯১৮ সালের ২২শে এপ্রিল শিমলা থেকে গৃহীত ও প্রকাশিত হয়। এই রির্পোটকেই পরবর্ত্তীকালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রির্পোট নামে অভিহিত করা হয়। এই মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের একটি অংশ সরাসরি গ্রামীন স্থানীয় প্রশাসন সংক্রান্ত। রিপোর্টে মন্তব্য করা হয় যে, ভারতবর্ষের গ্রামীন এলাকার প্রশাসন মূলতঃ জেলা প্রশাসনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে। তিনিই প্রশাসনের মধ্যমনি। এই রিপোর্টে জেলা প্রশাসককে সামরিক বাহিনীর কোন অধঃস্তন কর্মকর্তার অধীনে না রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়। [২০]। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে বলা হল যে, গ্রামীন এলাকায় বিভিন্ন কারনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার ব্যবস্থা সফল হতে পারে নাই। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরনের নিমিত্তে গঠিত রাজকীয় কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গেও মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট একমত হতে পারে নাই। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের মতে, '' স্থানীয় স্ব-শাসিত সরকারকে বলিষ্ঠভাবে বেচে থাকতে সহায়তা দেয়াই হল এ মুহূর্তে আমাদের গুরুত্বপূর্ন প্রথম কাজ''[২১]। এই রিপোর্টে স্থানীয় সংস্থাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন সুপারিশমালা পেশ করা হয়। রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, রাজনীতি শিক্ষায় ভারতীয়দের উপযুক্ত করতে হলে ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্থাকে ঢেলে সাজানো দরকার। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর ও বিচার বিভাগীয় সামান্য কিছু ক্ষমতা স্থানীয় সরকারের হাতে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে এই রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ করা হয়।

এই রিপোর্টের আলোকে পরবর্ত্তীতে গ্রাম্য স্ব-শাসিত সরকার আইনের খসড়া উপস্থাপন করা হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ডের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই আইনটির উদ্ভব। এই বিলে সরকার বিদ্যমান চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটিকে একত্রিত করে একটি নুতন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি করেন। নতুন গঠিত সংস্থাটির নাম হয় ''ইউনিয়ন বোর্ড''। নব্য প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন বোর্ডের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে এবং এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত করার বিধান রাখা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি বা চেয়ারম্যান বোর্ডের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন বোর্ডকে গ্রামে সেবামূলক কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহসহ গ্রামের যাবতীয় কাজের ব্যাপারে ক্ষমতা দেয়া হয় [২২]। এই বিল তৎকালীন বঙ্গীয়আইন পরিষদে উঠলে মরহুম জননেতা শেরে বাংলা এ,কে ফজলুল হক আইন পরিষদের অধিবেশনে বিলের সমালোচনা করে বলেন যে, প্রধানতঃ দুইটি কারনে আইনটি অকার্যকর হবে

Dhaka University Institutional Repository

[২৩]। প্রথমতঃ প্রস্তাবিত ইউনিয়ন বোর্ড পর্যাপ্ত তহবীলের অভাবে পড়বে। দ্বিতীয়তঃ ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতের মুঠোর মধ্যে থাকবে। তিনি আরো অভিমত প্রকাশ করেন যে, স্থানীয় বিষয়াদি সম্পর্কে জেলা প্রশাসকের উপর অর্পিত দায়িত্ব জেলা বোর্ডের হাতে ন্যস্ত করা উচিত। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ স্বাচ্ছন্দ্যতা ও কাজের স্বাধীনতা ভোগ করবে। বঙ্গীয় আইন পরিষদের কতিপয় সদস্য মনোনয়নের মাধ্যমে অগনতান্ত্রিক পন্থায় সদস্য নির্বাচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তাদের বিরোধিতা আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে টিকে নাই। এছাড়া আরো কতিপয় সদস্য বিভিন্নভাবে প্রস্তাবিত বিলের কড়া সমালোচনা করেন। বিলটি বাছাই কমিটিতে (সিলেক্ট কমিটি) প্রেরন করা হয় এবং বিলের উপর প্রচুর বাকবিতন্ডার পর অবশেষে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিলটি গৃহীত হয়ে ''বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসিত সরকার আইন ১৯১৯'' নামে অভিহিত হয়। অনেক লেখক ও প্রখ্যাত আইনবিদ একে বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার আইন- ১৯১৯ হিসাবেও অভিহিত করেছেন।

এই নুতন আইনে ছয়জন থেকে নয়জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন বোর্ড গঠিত হতো। এসব সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ জেলা প্রশাসকের মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। মূলতঃ সার্কেল অফিসার (সি,ও) মনোনীত ব্যক্তিদের এই তালিকা তৈরি করতেন। এবং সেটি মহকুমা কর্মকর্তার কাছে প্রেরন করতেন। তৎকালীন মহকুমা কর্মকর্তা (এস, ডি,ও)সার্কেল অফিসারের পাঠানো এই তালিকা কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন করে চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরন করতেন [২৪]। সাধারনত ২৫ থেকে ৩৫ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে প্রায় ১০টি গ্রামের সমন্বয়ে ছয়হাজার থেকে আটহাজার জনঅধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন গঠন করা হতো [২৫]। যদিও এভাবে মনোনয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া ছিল অগনতান্ত্রিক তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু শ্রেনী ও সম্প্রদায়ের স্বার্থে এ ব্যবস্থাকে মেনে নেয়া হতো। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় এসব ক্ষেত্রে সমতা বিধানের চেষ্টা করতেন। যেখানে হিন্দু সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সেই ইউনিয়নে তিনি দুইজন মুসলমান সদস্যকে মনোনয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য করতেন অন্যদিকে যেখানে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যাগুরু সেখানে দুইজন হিন্দু সদস্যকে মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য করতেন। সার্কেল অফিসার (সি,ও) এই মনোনয়নের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করে জেলা প্রশাসকের মনোনয়নের কাজে গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা পালন করতেন। একারনে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ তার সুনজর লাভের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করতেন। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড আবার কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। দুইটি অথবা তিনটি গ্রাম নিয়ে এক একটি ওয়ার্ড গঠন করা হতো এবং প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে তিনজন সদস্য বোর্ডের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। এসব নির্বাচনে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বীতা হতো এবং ভোটারেরা সাগ্রহে ভোট প্রদান করতেন। এসব নির্বাচনে ৮০% থেকে ৮৫% ভোটার ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেন। বৃটিশ আমলে গ্রাম বাংলার মানুষ

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন ও গনতান্ত্রিক আস্বাদ পেতে শুরু করলো মূলতঃ এই সময় থেকেই। এন.সি.রায় এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ''বাঙালী আজ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো'' (২৬)।

প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের মধ্য থেকে একজন প্রেসিডেন্ট (সভাপতি) ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হতেন। প্রেসিডেন্ট (সভাপতি), সহ-সভাপতি ও সদস্যরা চারবছর মেয়াদকাল পর্যন্ত স্ব-স্ব পদে বহাল থাকতেন। জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে সার্কেল অফিসার ইউনিয়ন বোর্ডের সভা ডেকে সভাপতি, সহ-সভাপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেন। পাঁচজন থেকে নয়জন সদস্যর উপস্থিতিতে সভার কাজ শুরু হতো। যদি কোন কারনে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা নির্বাচিত হবার পর নিজেরা এক মাসের ভিতর সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচনে ব্যর্থ হতেন সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সদস্যদের মধ্যে থেকে সভাপতি ও সহ-সভাপতি মনোনীত করে দিতেন (২৭)।এই ইউনিয়ন বোর্ড পুর্ব্বতন দুইটি সংস্থার দায়িত্বও পালন করতো। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রাথমিক কাজ ছিল গ্রাম্য চৌকিদারদের তদারকী করা ও ইউনিয়নের থেকে খাজনা আদায় করা। এছাড়া, রাস্তা-ঘাট ও পুল-সেতু সংরক্ষন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ও তদারকী এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। এছাড়া অনুদান গ্রহন, ইউনিয়নের বাৎসরিক কর আদায় ও চৌকিদারদের বেতন প্রদানও এর কাজ ছিল। ইউনিয়নের আয়তন অনুসারে একটি ইউনিয়নে ছয়জন থেকে ষোলজন চৌকিদার এবং একজন থেকে দুইজন দফাদার থাকতো।

এই ব্যবস্থার একটি নেতিবাচক দিক ছিল কঠিন ও জটিল ধরনের ভোটাধিকার ব্যবস্থা। মেয়েদের কোন ভোটাধিকার ছিল না (২৮)। পুরুষের ক্ষেত্রে ভোটার হতে হলে ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা ও কমপক্ষে ২১ বছর বয়স সম্পন্ন হতে লাগতো। আবার সর্বনিম্ন একটাকা করদাতারই ভোটাধিকার ছিল। আরেকটি দিক লক্ষ্যনীয় ছিল যে, নির্বাচনের সময় ভোটগ্রহন কালে ভোটারকে কর্মকর্তাদের সামনে যেয়ে ও প্রার্থী বা তার এজেন্টদের উপস্থিতিতে নিজ মুখে পছন্দের প্রার্থীরনাম বলতে হত । এই পরিস্থিতিতে একজন ভোটার কখনই স্বাধীনভাবে তার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারতেন না (২৯)। আরেকটি বিষয় ছিল, ইউনিয়ন বোর্ড দফাদার ও চৌকিদারদের শুধুমাত্র চাকরির জন্য মনোনয়ন দিতে পারতো কিন্তু তাদেরকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ করতেন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক। পূর্বের স্থানীয় কাউন্সিলের মতো ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ দায়িত্বে গাফিলতির জন্য কিংবা অসদাচরনের জন্য চৌকিদার ও দফাদারদের বরখাস্ত করতে পারতোনা । যদিও ইউনিয়ন বোর্ড এক্ষেত্রে তাদের মতামত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানোর অধিকারী ছিলেন তবে জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো এসব মতামতের কোন গুরুত্ব ছিলনা। ইউনিয়ন বোর্ডে সদস্য নির্বাচনে মনোনয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ কখনোই মনোনয়ন পদ্ধতির উদ্দেশ্য সফলতা লাভ করে নাই (৩০)। উপরন্ত ইউনিয়ন বোর্ডগুলো সম্পূর্নভাবে জেলা বোর্ডের দানের উপর নির্ভরশীল ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিষয়ে সরকারকে কৃতিত্ব দিতে হয়, সেটি হলো এ সময়ে অবিভক্ত বাংলার প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডের অস্তিত্ব ছিল। এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯২৭ সালে অবিভক্ত বাংলায় ইউনিয়ন বোর্ডের সংখ্যা ছিল২৮৭৪ টি, ১৯৪০ সাল নাগাদ এটি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫১২৬ টি [৩১]। তবে এর পাশাপাশি নুতন নুতন ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার সরকারী উদ্যোগ স্বরাজ আন্দোলনরত নেতৃবৃন্দ দ্বারা প্রচন্ডভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয় ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। কেননা তৎকালীন ভারতীয় নেতৃবৃন্দ দেখলেন যে, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ মূলতঃ বৃটিশদের খাজনা আদায়ের সুনিশ্চিত লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রতারনামূলক প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই নয় [৩২]।

আশ্চর্য্যজনক হলেও সত্য বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামলের পর স্বাধীন বাংলাদেশের প্রায় ৩০ বছরেও এদেশের স্থানীয় প্রশাসন ব্যাবস্থা আজপর্যন্ত তার অতীত চারিত্রিক বৈশিস্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছে। সামান্য তহবীল, অবহেলিত অবকাঠামোগত অবস্থা, সর্বোপরি স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন পর্যায় সম্পর্কে সরকারের মনোযোগের অভাব আজো একে নতজানু করে রেখেছে। অথচ এই ইউনিয়ন কমিটি সম্পর্কে লাউলাট কমিটি (বঙ্গীয় প্রশাসনিক তদন্ত কমিটি নামে পরিচিত) ১৯৪৫ সালে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, ''বাংলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হিসাবে পরিগনিত হতে পারে এবং এদের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডকেই আমরা সবথেকে সম্ভাবনাময় মনে করি'' [৩৩]। তবে এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি তৎকালীন সময়ে উঠেছিলো তা' হলো এই প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়াটি কেমন হবে? এটি কি সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্ব্বোচ স্তর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে গঠন করা হবে? নাকি উচ্চস্তর থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত পদসোপান ভিত্তিক পর্যায় ক্রমিক গঠন প্রক্রিয়ায় গঠিত হবে? যাইহোক, এর মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বৃটিশ শাসিত তৎকালীন ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে বৃটিশ শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটে। পরিশেষে বলা যায়, এ দেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে বিধিবদ্ধ আইনের মাধ্যমে কাঠামোগত রূপ দেবার কৃতিত্ব বৃটিশ ভারতীয় সরকারের।

পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ইউনিয়ন বোর্ডগুলো পূর্বতন নিয়মেই পরিচালিত হয়ে আসছিল। ১৯৫৬ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের মোট ৩৫৮১টি ইউনিয়ন বোর্ড ছিল [৩৪]। ১৯৫৯ সালে

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের '' মৌলিক গনতন্ত্র আদেশ'' ঘোষনার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত এসব ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল [৩৫]। আইয়ুব খানের এই ঘোষনায় ইউনিয়ন বোর্ডের স্থলে '' ইউনিয়ন কাউন্সিল'' ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই মৌলিক গনতন্ত্র আদেশ অনুসারে ইউনিয়ন ও জেলা প্রশাসনের মাঝখানে থানা/তহসীল কাউন্সিল গঠনের ব্যবস্থা করা হয় [৩৬]। ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে সরকারী আমলারা বৃটিশ শাসনামলের মত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে মনোনয়ন দিতেন। নবগঠিত ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (পূর্বতন ইউনিয়ন বোর্ড সভাপতি) সদস্যদের মধ্যে থেকে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হতেন। মূলতঃ এই মনোনয়নের বিষয়টি জেলা প্রশাসক অথবা তার অধ:স্তন কর্মকর্তাগন স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে করতেন। মনোনয়নের মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য হবার বিধানটি ১৯৬৪ সালে বিলুপ্ত করা হয় [৩৭]। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানের এই উদ্ভট প্রশাসনিক সংস্কার স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোকে প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করে। তার এই সব পরিকল্পনাবিহীন আকস্মিক সংস্কার ছিল পূর্বতন নিয়মনীতি থেকে সম্পূর্ন ভিন্নধর্মী চরিত্রের। মৌলিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জেলা কাউন্সিল ছিল স্থানীয় প্রশাসনের কেন্দ্র বিন্দু। থানা কাউন্সিল তার উপর অর্পিত সামান্য ক্ষমতাচর্চা করত এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহ তহবিলের জন্য এদের পিছনে ঘুরত। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন কাউন্সিলসমূহকে জেলা প্রশাসনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল জেলা কাউন্সিল, থানা/তহসীল কাউন্সিল, এমনকি ইউনিয়ন কাউন্সিলের শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য এবং এই দুই কাউন্সিলের সভাপতিও কালেক্টরেটের মনোনীত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকেই হতেন। মৌলিক গনতন্ত্রের সময়েও জেলা প্রশাসক জেলা কাউন্সিলের উপর দোদন্ড প্রতাপ ও নিয়ন্ত্রন বজায় রেখে চলছিলেন, যেমনটি বিগত প্রায় ৫০ বছরে আমলাতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবে তারা স্থানীয় প্রশাসনের উপর রেখেছিলেন। আইয়ুব খান বৃটিশ আমলে গঠিত ভারতীয় রাজকীয় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন কমিশনের প্রদত্ত রিপোর্টের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষনা করলেন। সেখানে বলা হয়েছিল, ''আমরা মনে করি যে ব্যাপারটি (স্থানীয় সরকার) জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থাকতে হবে'' [৩৮]।

এই নবগঠিত স্থানীয় সরকারের একটি মারাত্মক সমস্যা ছিল তহবীল স্বল্পতা । এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হতো ইউনিয়ন কাউন্সিলকে দেয়া সরকারী আর্থিক অনুদান থেকে। কিন্তু সরকারী নিয়মিত অনুদান ইউনিয়ন কাউন্সিলকে তার মূলকাজ অর্থাৎ '' খাজনা আদায় করা'' , সেলক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে। এরফলে ইউনিয়ন কাউন্সিলের নিজস্ব আর্থিক ব্যবস্থাপনা দূর্বল হয়ে পরে এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলের নিজস্ব তহবীল সৃষ্টির কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পরে। এ ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, নিজ নিজ ইউনিয়ন কাউন্সিলে অধিক হারে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

অনুদানের আশায় সরকারী কর্মকর্তাদের প্রতি হীনভাবে বশ্যতা স্বীকারের একটি কুপ্রবনতা এসব ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে গড়ে উঠতে শুরু করে [৩৯]।

ইউনিয়ন কাউন্সিলের বিভিন্ন কার্যাবলী সমীক্ষা করে দেখা যায় যে, কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত বেশীর ভাগ কাজই সরকারী সচিবালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চিঠি ও সার্কুলারের ভিত্তিতে করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যেত যে, ইউনিয়নসমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু মাত্র সরকারী নির্দেশই পালন করে। খুব কমক্ষেত্রেই তারা স্বতঃফূর্তভাবে কোন কাজে হাত দিত। ইউনিয়ন কাউন্সিলের এমন কর্মদক্ষতাহীনতার জন্য , স্থবিরতার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগনও ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। পি.এ.আর.ডি রিপোর্ট অনুসারে বলা যায়, ''সদস্যগন এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, সরকারী কর্মকর্তাগন শুধু মাত্র চেয়ারম্যানের সাথেই কথা বলেন। তারা সদস্যদের দিকে কোন নজর দেন না'' [৪০]। এই প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যরা নীতি-নির্ধারনে অংশ নিতে পারতেন না এবং তাদের মধ্যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের কাজের প্রতি অনাগ্রহতা সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে সরকারী অনুদান গ্রহনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে চেয়ারম্যান ও সরকারী স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে গোপনে অবৈধ অর্থনৈতিক সু-সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে [৪১]। সার্কেল অফিসারের (উন্নয়ন) মাধ্যমে ইউনিয়ন কাউন্সিল সমূহের সরকারী অনুদান প্রদানের সময় এমনভাবে অনুদান বন্টন করা হতো যাতে করে সরকারী প্রশাসনের উপর ইউনিয়ন কাউন্সিলকে নির্ভরশীল থাকতে হয়। একথা প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে যে, মৌলিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতির ভিত্তি বেশ পোক্ত ভাবে স্থাপন করেছিল [৪২]। এই ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান নির্বাচনের পরোক্ষ পদ্ধতি দুর্নীতির অনেক দরজা খুলে দিয়েছিল। এছাড়া ''নির্বাচক মন্ডলী'' হিসাবে সদস্যদের একটি রাজনৈতিক ভুমিকাও ছিল। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা তাদের স্থানীয় এলাকায় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করতেন [৪৩]। এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়। এসময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের অফিস-ঘর, রাস্তা-ঘাট, পুলনির্মান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজ ত্বরান্বিত হয়। তবে একথাও সত্য যে, ত্রুটিপূর্ন নির্বাচন ব্যবস্থা এর উদ্দেশ্যকে অনেকাংশে ব্যহত করেছিল। বিশেষত: চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হতেন বলে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া সহজতর ছিল। মনোনয়ন প্রথা পরবর্ত্তীকালে বিলুপ্ত করা হয়। এখানে একটি কথা না বললেই নয়, তা'হলো স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের জায়গায় প্রতিস্থাপিত মৌলিক গনতান্ত্রিক প্রকল্পটি ছিল আমলাদের কঠোর কর্তৃত্বাধীন। উপনিবেশিক শাসকদের পদাঙ্ক অনুসরন করে তৎকালীন পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের সদস্যরা কৌশলে নিজেদের হাতেই সকল ক্ষমতার চাবিকাঠি রেখে দেন। আমলাতন্ত্রের এই মাত্রাতিরিক্ত খবরদারী ও কৌশলের ফলে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকা সত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে ইউনিয়ন কাউন্সিল কোনরুপ ভূমিকাই রাখতে পারে নাই।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আমল

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহতি পরেই ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির ৭নং আদেশ বলে রাষ্ট্রপতি মৌলিক গনতন্ত্রের সবকটি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রশাসক নিয়োগ করেন। ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রশাসক ছিলেন ইউনিয়নের কৃষি অফিসার বা তহসীলদার। তবে ত্রান কার্যক্রম চালানোর সুবিধার্থে সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে স্থানীয় আওয়ামী লীগের মধ্যে থেকে ''রিলিফ কমিটির'' সদস্য ও চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। সে বছরই (১৯৭২) রাষ্ট্রপতির ২২নং আদেশ দ্বারা '' ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ''ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নবগঠিত এই ইউনিয়ন পঞ্চায়েতসমূহ রিলিফ কমিটি গুলোর স্থলাভিষিক্ত হয় [৪৪]। রিলিফ কমিটির মতোই ইউনিয়ন পঞ্চায়েত সম্পূর্নভাবে মনোনীত সংস্থা ছিল। রাষ্ট্রপতির উক্ত আদেশে এটাও বলা হয়েছিল যে, নুতন সংবিধানের আওতায় গঠিত জাতীয় সংসদ কর্তৃক স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের কাঠামোর পুনঃগঠন না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ এ ব্যাপারে ১৯৭৩ সালের জুন মাসে বিস্তারিত আইন পাশ করে [৪৫]। এতে স্থানীয় সরকারের সদস্য-কর্মকর্তাদের আইনানুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবার বিধান করা হয়। এই আইন অনুসারেই ইউনিয়ন পঞ্চায়েতসমূহকে '' ইউনিয়ন পরিষদ '' নামে অবহিত করা হয়। একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান এবং নয়জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হত । আইনের বিধান অনুসারে এদের সবাই সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত হতেন [৪৬]। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় [৪৭]। এই ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানের মধ্যে দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা বিভাজনের সুস্পষ্ট বিধান না থাকায় প্রায়ই মতদ্বৈধতা সৃষ্টি হতে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম হয় ফলশ্রুতিতে অনেক স্থানে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান তাদের অনুসারী সদস্যদের নিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে কাজকর্ম চালাতে থাকেন [৪৮]।

তিনবছর পর ১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর '' স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ-১৯৭৬'' জারীকরা হয়। এতে নতুন করে স্থানীয় সরকারের গঠন ও কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম কানুন প্রনয়ন করা হয় এবং স্থানীয় সরকার সম্পর্কিত কতিপয় বিধিবিধান সংশোধন করা হয় [৪৯]। অত্র অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবার বিধান করা হয়। এই অধ্যাদেশে ১৯৭৩ সালে গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সৃষ্ট ভাইস চেয়ারম্যান পদের বিলুপ্তি ঘোষনা করা হয়। ইউনিয়ন কাজে মহিলাদের ব্যপক অংশগ্রহনের লক্ষ্যে দুইজন মহিলা সদস্য রাখার বিধান চালু করা হয়। পরবর্তীতে অধ্যাদেশে সামান্য সংশোধনী আনয়ন করে এতে দুইজন কৃষক প্রতিনিধি রাখার বিধান করা হয়।স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তার সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক অথবা তার অধীনস্ত কর্মকর্তা এই দুইজন

Dhaka University Institutional Repository

মহিলা সদস্যা ও দুইজন কৃষক প্রতিনিধিকে মনোনীত করতেন। মহিলা সদস্যা মনোনয়নের পক্ষে নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহ দেয়া হয়েছিল ।প্রথমতঃ বাংলাদেশের মহিলাদের বেশীর ভাগ অংশই নিরক্ষর। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করার মতো যোগ্যতা ও সার্মথ্য তাদের খুব কমই রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এদেশের মহিলারা খুবই রক্ষনশীল। এমনকি গ্রামীন শিক্ষিত মহিলারাও স্থানীয় প্রশাসনিক কাজকর্মে খুবই কম অংশগ্রহন করেন। তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের অর্ধেক নারীগোষ্টির অংশগ্রহন ব্যতিত কিভাবে নারীসমাজের বৃহত্তর কল্যান ও দেশের উন্নয়ন সাধিত হবে। নারী অংশগ্রহন ব্যতিত উন্নয়ন কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্থ হবে এবং সর্বোপরি নারীসমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডে কিংবা নির্বাচনে অংশগ্রহনের যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মনোনয়নের মাধ্যমে নির্বাচিত করা যেতে পারে [৫০]।

কৃষক প্রতিনিধি মনোনয়নের পক্ষে প্রধান যুক্তি ছিল এতে করে স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রতি কৃষকদের অংশগ্রহনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এরফলে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে থেকে সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষকেরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে এগিয়ে যাবেন।

এ অধ্যাদেশ অনুসারে নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নকে তিনটি ওয়ার্ডে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে তিনজন সদস্য নির্বাচিত হতেন। নয়জন সদস্য ও এক জন চেয়ারম্যান নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। এর পাশাপাশি দুইজন মহিলা সদস্য ও দুইজন কৃষক প্রতিনিধি মনোনীত হতেন। ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদকাল হয় পাঁচ বছর। এছাড়া অসদাচারন, দ্বায়িত্বে অবহেলা এবং দৈহিক অসামর্থ্যর জন্য চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অপসারনের একটি বিধানও এতে ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে পারতেন [৫১]। চেয়ারম্যান ও সদস্যগন প্রত্যেক মাসে যথাক্রমে ৩০০/= টাকা ও ১০০/= টাকা হারে সম্মানী পেতেন। এই সম্মানীর অর্ধেক অংশের অর্থ আসতো সরকারী বরাদ্দ থেকে এবং বাকী অর্ধেক ব্যয় মিটানো হতো ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সংগৃহীত খাজনা থেকে। এই অধ্যাদেশে চেয়ারম্যানের হাতেই ইউনিয়ন পরিষদের যাবতীয় নির্বাহী ক্ষমতা অর্পন করা হয়। সরকারী কার্যক্রম ও অন্যান্য বিষয়াদির ব্যাপারে সভা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। এসব সভায় চেয়ারম্যান স্বয়ং সভাপতিত্ব করতেন এবং তার অনুপস্থিতে সদস্যদের মধ্য থেকে একজন এতে সভাপতিত্ব করতেন। সভার কার্যবিবরনী লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি বই রাখা হয় এবং এতে প্রত্যেক সভার কার্যবিবরনী লিপিবদ্ধ করা হতো। ইউনিয়ন পরিষদের সেক্রেটারী সরকারের সাথে চিঠি-পত্র আদান-প্রদান এবং প্রাত্যহিক প্রশাসনিক কাজে চেয়ারম্যানকে সহায়তা করতেন। ইউনিয়ন সেক্রেটারী মহকুমা কর্মকর্তা (এস.ডি.ও) কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন এবং এই চাকরী থানার মধ্যে বদলীযোগ্য করা হয়। চৌকিদার ও দফাদারেরা ইউনিয়নের শান্তি বজায় রাখতে পরিষদকে সাহায্য করতো। ইউনিয়ন পরিষদসমূহ তাদের উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার কাজে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটি গঠন করতো [৫২] । এসব কমিটি ও সাব-কমিটি সমূহ তাদের উপর অর্পিত কাজের দ্বায়িত্ব পালনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য এবং এর বাইরে থেকেও সদস্য নিতে পারতেন। প্রতিটা ওয়ার্ডের মেম্বারদের মধ্য থেকে একজনকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠনের আবশ্যিক বিধান এতে রাখা হয়। কৃষক, শিক্ষক, ডাক্তার ও সমাজকর্মীদের মধ্য থেকে বেশীর ভাগ সদস্য নেয়া হতো। কমিটি খাদ্য উৎপাদন, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্যসেবা, সর্বোপরি গ্রামীন এলাকার উন্নয়নে যেসব পরিকল্পনা নেয়া হতো তা'তদারকী করতো। উন্নয়ন কর্মকান্ড চালু রাখতে ইউনিয়ন পরিষদ সরকারী অনুদানও গ্রহন করত। এই অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদসমূহ পূর্বের ন্যায় চৌকিদার ও দফাদারদের খরচ নির্বাহের জন্য স্থানীয় জনগনের কাছ থেকে খাজনা ও চাঁদা আদায় করার অধিকার প্রাপ্ত হয়। ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশের আওতায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারীর জন্য জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষন ও ওরিয়েন্টেশন কোর্স চালু করা হয় [৫৩]। ১৯৮০ সালের ৩০শে এপ্রিল ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি গ্রামীন এলাকার উন্নয়নের জন্য ''গ্রাম সরকার প্রকল্প'' গ্রহন করা হয় [৫৪]। সরকার ইউনিয়ন পরিষদের পাশাপাশি গ্রাম সরকার ব্যবস্থা চালু করেন মূলতঃ সংস্থা দুইটি পাশাপাশি কাজ করে উন্নয়ন তরান্বিত করবে এই আশায় । এটা আমাদের বৃটিশ শাসনামলের দ্বৈত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কথা স্মরন করিয়ে দেয়। যা কিনা একসময়ে স্থানীয় পর্যায়ে শুধু দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল।

এরশাদ শাসনামলে (১৯৮২-১৯৯০) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ নেয়া হয়। এরশাদের শাসনকালের দুইটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো ''উপজেলা'' পদ্ধতি প্রর্বতন এবং ইউনিয়ন পরিষদের পুনঃগঠন সংক্রান্ত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ-১৯৮৩ প্রনয়ন। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে উপজেলা পদ্ধতি উদ্বোধন করা হয় এবং ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সারা দেশে ৪৬৪টি উপজেলা গঠন করা হয়। ১৯৯১ সালে বি.এন.পি সরকার ক্ষমতায় এসে এই উপজেলা পদ্ধতি বাতিল করে দেন। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে উপজেলাকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সংসদে উপজেলা আইন-১৯৯৮ পাশ করেন। সরকার উপজেলা পরিষদ পুর্নগঠনের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে মাঝামাঝি সময়ে উপজেলা নির্বাচন হতে পারে বলে ইতিমধ্যে ঘোষনা করেছেন। উপজেলা পদ্ধতিতে উপজেলা চেয়ারম্যান পাঁচ বছরের জন্য জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন ও থানা (উপজেলা) নির্বাহী কর্মকর্তার বার্ষিক গোপন প্রতিবেদন লিখবেন।

১৯৮৩ সালের অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল ইউনিয়ন পরিষদের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারিকরন। ১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এই অধ্যাদেশ জারী করা হয়। এখানেও পূর্বাপর আইনের মতো ইউনিয়ন পরিষদের উন্নতির ব্যাপারে আমলা নির্ভরতা চালু রাখা হয়। এই অধ্যাদেশকে সংশোধন করে মহিলা সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের উপর কর্তৃত্ব দেয়া হয় [৫৫]। এর মধ্যে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদ প্রশাসনকে গ্রামীন

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের দোড়গোড়ায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যে ১৯৮০ সালে বি.এন.পি শাসনামলে গঠিত গ্রাম সরকারের অনুকরনে ''পল্লী পরিষদ'' গঠনের পরিকল্পনা করেন। ১৯৮৯ সালে ৪র্থ জাতীয় সংসদে পল্লী পরিষদ আইন পাশ করেন [৫৬]। এতে গ্রামীন জনগনের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পল্লী পরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কিংবা ইউনিয়ন মেম্বার পল্লী পরিষদের সদস্য হতে পারবেন না বলে বিধান রাখা হয়। এই আইনে বলা হয় যে, পল্লী পরিষদের সীমানা ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্ধারন করবে। অন্যদিকে ইউনিয়ন পরিষদের অনুদানের উপর ভিত্তি করে পল্লী পরিষদের তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩কে সংশোধন করে একটি আইন পাশ করা হয় [৫৭]। এতে বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনছেদ অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে মর্যাদা দেয়া হয় [৫৮]। সেই সাথে অপর একটি আইনের মাধ্যমে বিদ্যমান পৌরসভা সমূহকেও প্রশাসনিক ইউনিটের মর্যাদা দেওয়া হয় [৫৯]। ১৯৯৩ সালে এক সংশোধন আইনের বলে প্রতিটি ইউনিয়নে মহিলাদের জন্য তিনটি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এতে একটি ইউনিয়নকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয় । প্রতিটি ইউনিয়নে একজন চেয়ারম্যান ও নয় জন সদস্যর সমন্বয়ে ইউনিয়ন পরিষদ গঠনের বিধান করা হয় এবং নির্বাচন পরিচালনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থানা নির্বাহী অফিসারের (পূর্বের উপজেলা নির্বাহী অফিসার) হাতে দেওয়া হয় [৬০]।

পাদটীকা

(১)দেখুন,A.H.M. Aminur Rahman , Politics of Rural Local Self-government in Bangladesh, (Dhaka: University of Dhaka, 1990), পৃষ্ঠা-৪৫।

(২)বহু লেখক এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, প্রাচীন ভারতের স্থানীয় শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল। এ প্রসঙ্গে বিস্তারিতের জন্য দেখুন; A.L Basham, The wonder that was India : A Survey of the History and Culture of the Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims (Delhi: Rupa and Co.,1989), পৃষ্ঠা- ১০৫।

(৩)দেখুন, Lord Hailey , in the 'foreward' to Hugh Tinkers , Foundations of Local Self Government in India, Pakistan and Burma (London: Athlone Press, 1954,)p.xii.

Dhaka University Institutional Repository

(৪)জন ম্যাথাই তার পুস্তকে গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্ণনা করেছেন। দেখুন, John Mathai , Village Government in British India(London: T.Fisher Urwin Ltd.,1915) , পৃষ্ঠা-৩৯-১৯৮।

(৫)উদ্ধৃতি,দেখুন, R.V. Jathar , Evolution of Panchayati Raj in India (Dharwar: Institute of Economic Research, 1964), পৃষ্ঠা-১১।

(৬)দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৭।

(৭)উদ্ধৃতি, দেখুন, Muzaffar Ahmed Chaudhury, Rural Government in East Pakistan (Dhaka: Puthighar, 1969), পৃষ্ঠা-৩।

(৮)বিস্তারিত দেখুন, রবার্ট এরিক ফ্রাইকেনবার্গ সম্পাদিত পুস্তকের ভূমিকার মধ্যে।Robert Eric Frykenberg, Land Control and Social Structure in Indian History (Madison: University of Wisconcin press,1969), পৃষ্ঠা-১৩-২১

(৯)দেখুন, Philip B. Calkins, "The Formation of a Regionally Oriented Ruling Group in Bengal", Journal of Asian Studies, Vol. 29,No-2, 1970,পৃষ্ঠা-৭৯৯-৮০৬।

(১০) দেখুন, H.V. Lovett, "District Administration in Bengal 1818-1885",H.H. Dodwell কর্তৃক সম্পাদিত , The Cambridge History of India, Vol-VI (Delhi: S.Chand and Co., 1958), পৃষ্ঠা-২০-৩৫; বিস্তারিতের জন্য আরো দেখুন,Government of Bengal , Bengal Administration Report 1871-72 (Calcutta: Bengal Secretariat Press,1872), পৃষ্ঠা-১৯২।

(১১) দেখুন, Rehman Sobhan, Basic Democracies , Works Programme and Rural Development in East Pakistan (Dhaka: Bureau of Economic Research, University of Dhaka, 1968), পৃষ্ঠা-৭৩-৭৯।

(১২) দেখুন, M.Rashiduzzaman, Politics and Administration in the Local Councils: A Study of Union and District Councils in East Pakistan (Dhaka: Oxford University Press, 1968)পৃষ্ঠা-১,আরো দেখুন,Muzaffar Ahmed Chaudhury, "District Boards in Bengal and East Pakistan", Administrative Science Review, Vol-II, No-4, December, 1968, পৃষ্ঠা-৮৩-১০৯।

(১৩) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮।

(১৪) চৌকিদারী পঞ্চায়েতের কাজের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ১৮৮২ সালে নিষ্টার জেমস মনরোকে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিশন বিষয়টি সম্পর্কে যথোপযুক্ত তদন্ত ও অনুসন্ধান শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত পৌঁছেন। (১) চৌকিদারী পঞ্চায়েত

Dhaka University Institutional Repository

তার মূল উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। (২) চৌকিদারদের বেতন প্রদানে ভোগান্তির শিকার হতে লাগছে। (৩) চৌকিদাররা ভোগান্তি এড়াতে বেতন ছাড়াই কাজ করছেন। (৪)পঞ্চায়েতের সদস্য হবার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সম্ভ্রান্ত মানুষেরা অপছন্দ করতেন। কেননা অপর্যাপ্ত কর আদায় হলে পঞ্চায়েত সদস্যদের সম্পত্তি ক্রোক করা যেত।(৫) পঞ্চায়েতের জনপ্রিয়তা না পাবার পিছনে আরেকটি কারন হল সাধারন মানুষ ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের হাতে ভোগান্তির শিকার হতেন। (৬) পঞ্চায়েতের অনেক কাজই নিরপেক্ষ ছিলনা এবং পঞ্চায়েতের প্রদত্ত হিসাবেও ছিল অনেক গোঁজামিল। (৭) পঞ্চায়েতের হাতে অর্পিত দায়িত্ব ছিল পরস্পর বিরোধী। কোন চূড়ান্ত দায়িত্ব এর হাতে দেবার ব্যবস্থা ছিলনা।(৮) পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা হয়না। কমিটি এসংক্রান্ত আইনেব ব্যাপক পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করেন এবং চৌকিদারী পঞ্চায়েতের উপর অর্পিত বিভিন্নমূখী কাজ প্রত্যাহারের সুপারিশ করেন। দেখুন,Government of Bengal , Papers Regarding The Village and Indigenous Agency Employed in Bengal (Calcutta: Bengal Government Book Depot. 1890).

(১৫) দেখুন, N.C. Roy, Rural Self-Government in Bengal(Calcutta : Calcutta University Press, 1936),পৃষ্ঠা-২৫।

(১৬) দেখুন, Government of Bengal, Bengal Code, Act-III of 1885, Para-41(a), (Calcutta: Govt.Press, 1885).

(১৭) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০।

(১৮) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman ,প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫০।

(১৯) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫২।

(২০) দেখুন, Abu Naser Shamsul Hoque, "District Administration in East Pakistan: its Classical form and the Emerging Pattern", Administrative science Review, Vol-IV, No-1, March-1970, পৃষ্ঠা-২১-৪৮

(২১) দেখুন, Government of Bengal, Report on Indian Constitutional Reforms (Calcutta: Govt.Press) পৃষ্ঠা-৮২

(২২) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৩.

(২৩) বঙ্গীয় আইন পরিষদে এ.কে ফজলুল হকের বক্তৃতা। proceedings of the Bengal Legislative Assembly Debates, 1918.

Dhaka University Institutional Repository

(২৪) জেলা প্রশাসকের ক্ষমতা ও পদ মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, Philip Woodruff, The man who Ruled India: The Gurdians (New York: Schocken Books, 1954).

(২৫) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৪

(২৬) দেখুন,N.C. Roy, Rural Self-Government of Bengal, (Calcutta: Calcutta University Press, 1936), পৃষ্ঠা-২৫-৩৮

(২৭) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৪

(২৮) ১৯৩৫ সালে এক সংশোধনীবলে এই প্রতিবন্ধকতা দুর করা হয়। এক টাকার স্থলে আট আনা প্রদানে সক্ষম করদাতাদের ভোটাধিকার দেয়া হয়। এই সংশোধনীতে মেয়েদের অনুপযোগিতা সম্পর্কে কিছু বলে নাই। যাই হোক সার্বজনীন ভোটাধিকার ১৯৩৭ থেকে চালু হয়।

(২৯) দেখুন, Muzaffar Ahmed Chaudhury, Rural Government in East Pakistan, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা- ১১

(৩০) দেখুন, S,D, Khan, Notes on Reorganisation of Local Bodies in The Province (Dhaka: Government of East Pakistan, 1956),পৃষ্ঠা- ১৪

(৩১) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman , প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৫

(৩২) দেখুন, Eliot Tepper, Changing Patterns of Administration in Rural East Pakistan (East Lansing: Asian Studies Center, Michigan State University, August, 1966),পৃষ্ঠা-৯৩

(৩৩) দেখুন, Report of the Bengal Administrative Enquiry Committee, 1944-45 (Alipur: Bengal Government Press, 1945), পৃষ্ঠা-৩৫। এই কমিটি স্থানীয় সরকারের মনোনয়ন পদ্ধতি বিলুপ্তির সুপারিশ করে।

(৩৪) দেখুন, S,D, Khan ,Notes on Reorganisationn of Local Bodies in the Province,পৃষ্ঠা- ১৩

(৩৫) দেখুন, Basic Democracies Order, Government of Pakistan (Pakistan Gazette, Extraordinary, Karachi, 27 October, 1959)

(৩৬) দেখুন, R. L. mellema, "Basic Democracies System in Pakistan, Asian Survey, vol.1, No-6, 1961,পৃষ্ঠা- ১০- ১৫

(৩৭) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

(৩৮) দেখুন, Government of Bengal, Report of the Royal Commission Upon Decentralisation in India, Vol.1 (London: H,M.S.O,1909), পৃষ্ঠা-৩০৩-৩০৪

(৩৯) দেখুন, A.T.R, Rahman, Basic Democracies at the Grassroots (comilla: Pakistan Academy for Rural Development (PARD), march, 1962), আরো দেখুন, A.T.R, Rahman and Harry J. Friedman, "Administration at the Grassroots; Pakistans Basic Democracies" The Philippine Journal of public Administration, vol.7, No-2, April 1963, পৃষ্ঠা- ১০২- ১১২

(৪০) দেখুন, Government of Pakistan, An Analysis of the Workings of the Basic Democracies Institution in East Pakistan, Bureau of National Reconstruction (BNR) and the Pakistan Academy for Rural Development (PARD) , Dhaka, 1961

(৪১) দেখুন, Emajuddin Ahamed ," Bureaucratic Elite in Bangladesh and Their Development Orientations", The Dhaka University Studies, Vol-XXVIII, June 1978, পৃষ্ঠা-৫২-৬৭

(৪২) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman , প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৮

(৪৩) মৌলিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের মেম্বার ও চেয়ারম্যান ''নির্বাচক মন্ডলী'' হিসাবে গন্য হতেন। এই নির্বাচক মন্ডলীগন রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত করতেন। দেখুন, Iqbal Narain,"Basic Democracies in Pakistan," Political Science Review, Vol, IV, No-1,1965, পৃষ্ঠা-৭৯-৯৬

(৪৪) দেখুন, A.H.M. Aminur Rahman , প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৫৮

(৪৫) দেখুন, Government of Bangladesh, The Bangladesh Gazette(Dhaka, June 30, 1973)

(৪৬) ১৯৭৩ সালে ভোটার হওয়ার জন্য বয়সের যোগ্যতা ২১ বছর থেকে কমিয়ে এনে ১৮ বছর করা হয়। দেখুন, Rounaq Jahan,"Members of Parliament",Legislative Studies, Vol-1, No-3, 1976.

(৪৭) বাংলাদেশের প্রথম ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়কাল ছিল ১১-১২-৭৩ হতে ৩০-১২-৭৩ পর্যন্ত। পরিশিষ্ট-ক-(৩) দেখুন।

(৪৮) দেখুন,Bilquis Alam,"Violence and the Union Parishad Ledership:A few Statistics",Local Government Quarterly,Vol-8,Nos.1-4,1979, পৃষ্ঠা-৩৮-৫১

Dhaka University Institutional Repository

(৪৯) দেখুন,Government of Bangladesh,The Bangladesh Gazettee.(Dhaka:Ordinance No.XC of 1976).

(৫০) গ্রামীন মহিলারা ''পর্দা'' মেনে চলেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের অবদান অতি নগন্য। জনসংখ্যার এই অর্ধেক অংশের প্রশিক্ষন ও যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান না করা গেলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকল আশা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। দেখুন, Azhar Ali, Rural Development in Bangladesh.(Comilla: Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), August, 1975), পৃষ্ঠা-৩৬

(৫১) দেখুন,Ali Ahmed,Administration of Local Self-Government for Rural Areas in Bangladesh.(Dhaka:National Institute of Local Government,1979), পৃষ্ঠা-১৪৭-১৭৬

(৫২) দেখুন, A.H.M.Aminur Rahman, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬০

(৫৩) দেখুন, Government of Bangladesh,The Bangladesh Gazette.Bangladesh Local Govornment (Union Parished and Paurashava) Amendment Act. (Dhaka: December, 1976).

(৫৪) দেখুন, Government of Bangladesh,The Bangladesh Gazette, Extraordinary, (Dhaka, 24 May, 1980).

(৫৫) দেখুন, Local Gorvrnment (Union Parishad) (Amendment) Act-1989 (act no 26 of 1989), Bangladesh Gazette, (Dhaka:7th June,1989)

(৫৬) দেখুন, Bangladesh Gazette, Extraordinary, (Dhaka: 20, June, 1989), পল্লী পরিষদ আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৩ নং আইন)।

(৫৭) দেখুন, The Local Government (Union Parishad) 2nd Amendment Act-1992, (Act 45 of 1992), Bangladesh Gazette, (Dhaka: 10, November, 1992)

(৫৮) দেখুন,গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান-১৯৭২, আইন ও বিচার মন্ত্রনালয়,অনুচ্ছেদ-৫৯

(৫৯) দেখুন, Powroshava Ordinance –1977, Amendment Act-1992 (Act 46 of 1992), (Dhaka: 10, November, 1992)

(৬০) দেখুন, Local Gorvrnment(Union Parishad) (Amendment) Act-1993 (act no 20 of 1993), Bangladesh Gazette, (Dhaka:22nd July,1993s)

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৩

বাংলাদেশে অনগ্রসর গ্রামীন অর্থনীতির প্রকৃতি ও সরকারী উন্নয়ন কৌশল

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রের বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অপরাপর দেশের মতো প্রায় অভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার এক সাধারন বেড়াজালে আবদ্ধ বাংলাদেশ তার স্বীয় রাজনৈতিক সমস্যার উন্নয়ন এবং দ্রুত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনা অনুসরন করে এগিয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের অপরাপর উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশও অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ও কৃষিভিত্তিক গ্রামীন উন্নয়নের উদ্দেশ্য বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহন করেছে। বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এসব পরিকল্পনার একটি নীতি হলো, ''দারিদ্র ও কর্মহীন জনগোষ্ঠির জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহন করে এদের জনশক্তিতে রূপান্তরকরন এবং [১]। অবহেলিত ও আশ্রয়হীন মানুষের জন্য পুণঃবাসন কর্ম প্রক্রিয়া চালুকরন। এসব প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও সাফল্যর মাধ্যমে কেবলমাত্র এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ দারিদ্রবিমোচন অনেকাংশে সম্ভবপর হতে পারে বলে সরকার মনে করেন [২]। সরকার গৃহীত এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য বিশ্লেষন করে সাধারনভাবে একথা বলা যায়, গ্রামীন এলাকার উন্নয়নই সরকারের সর্বপ্রথম ও প্রধান খাত হিসাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনের সর্বক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সর্বাগ্রে সুবিধাপ্রাপ্ত খাত হিসাবে স্থান করে নিয়েছে। সামগ্রিক দেশের উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলাদেশ সরকারও ইতিমধ্যে ঘোষনা করেছেন যে, গ্রামই হবে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু [৩]। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ্য যে, এই অভিষ্ট লক্ষ্যে ক্ষমতাসীন প্রায় প্রতিটি সরকারই বিভিন্ন আইন ও অধ্যাদেশ প্রনয়ন করেছেন, মান্ধাতার আমলের বহু অনুপযোগী আইনকে সময়োপযোগী করার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং বর্তমানেও সে ধারা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার প্রশাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স মডেল চালুর মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রীক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দ্রুতলয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। একথা সর্বজনবিদিত যে, বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের দারিদ্রতার জন্য বাংলাদেশ দায়ী নয়। এদেশের দারিদ্রতার কারন খুঁজতে হলে এর ঐতিহাসিক পটভূমিকা বিশ্লেষনের প্রয়োজন রয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাক ইংরেজ আমলে এদেশের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল ছিল। গ্রামভিত্তিক সরল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখানে প্রচলিত ছিল এবং তৎকালে গ্রামগুলি মোটামুটিভাবে স্বয়ংসম্পূর্ন ছিল [৪]। এবং এরা নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য নিজেরাই উৎপাদন করতো। ইংরেজদের ১৯০ বছরের শাসন

Dhaka University Institutional Repository

ফলে এদেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন পথের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিকাশের পথ প্রচন্ডভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। পরর্বতীতে পাকিস্তান আমলের ২৪ বছরেও [৫] এই শোষনের মাত্রা অব্যাহত থাকে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও প্রায় ১০০০ কোটি টাকার (২.২ মিলিয়ন ডলার) সম্পদ লুটপাট হয়েছিল। এছাড়া চোরাকারবারী, অবৈধ ব্যবসায়ীদের কারনেও একটি বিপুল পরিমান অর্থ প্রতি বছর এদেশ থেকে এখনো পাচার হয়ে যাচ্ছে। ফলে এদেশের পুঁজি বা মুলধন গঠন প্রক্রিয়া বার বার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

আসলে উন্নত দেশের তুলনায় যে সবদেশে জনসংখ্যা ও সম্পদের অনুপাতে পুজিঁ বা মুলধনের পরিমান কম সেই সব দেশই অনুন্নত। এ হিসাবে সাধারনভাবে বাংলাদেশও অনুন্নত বিশ্বের কাতারে পড়ে। জনগনের মাথা পিছু আয় এবং জাতীয় আয়ের স্বল্পতাকে অনুন্নত অর্থনীতির নির্দেশক হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। অনুন্নত বা অনগ্রসর অর্থনীতি একাধিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এগুলো হচ্ছে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, নিম্ন মাথাপিছু আয়, কৃষির উপর অত্যাধিক নির্ভরশীলতা, শিল্পে অনগ্রসরতা, বেকারত্ব, অপর্যাপ্ত পুঁজি, কারিগরী দক্ষতার অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ত ব্যবহার, শিল্প উদ্যোক্তার অভাব, পরনির্ভরশীলতা, প্রতিকূল সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশের অস্তিত্ব, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব ইত্যাদি। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি অনগ্রসর অর্থনীতির প্রকৃষ্ট উদাহরন। বাংলাদেশের এই অনগ্রসর অর্থনীতির প্রকৃতি ও সমস্যাগুলো হলো, সাধারন দারিদ্র্য, কৃষির উপর অত্যাধিক নির্ভরতা, ত্রুটিপূর্ন ভূমিব্যবস্থা, স্বল্প মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার নিম্নমান, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উর্দ্ধগতি, শিল্পে অনগ্রসরতা এবং শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা, প্রাকৃতিক ও মানবিক সম্পদের অপর্যাপ্ত ব্যবহার ইত্যাদি। এছাড়া পুজির স্বল্পতা, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা, বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্য ঘাটতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের অত্যাধিক উর্দ্ধগতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্বল ও ঘুনে ধরা প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সঠিক নির্দেশনার অভাবও অর্থনীতির উপর দারুন প্রভাব ফেলে থাকে। এছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাতো রয়েছে। এসবই দারিদ্র্যতার জন্য দায়ী এবং এদেশের অনগ্রসর অর্থনীতির অন্যতম কারন

বাংলাদেশের অনুন্নতির প্রকৃতি ও দারিদ্র্যতার স্বরূপ বিভিন্নভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। বাংলাদেশের আয়তন ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল (১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃমিঃ) এর মধ্যে ৩৬২৩ বর্গমাইল (৯৩৮৪ বর্গকিঃমিঃ) হলো নদী-নালা এবং ৯১৮৮ বর্গমাইল (২৩,৭৯৭ বর্গ কিঃমিঃ) হলো বনাঞ্চল। এরসাথে রয়েছে প্রতিবর্গ কিঃমিটারে ৭৫৫ জন মানুষের বসবাস (১৯৯১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা হলো প্রায় ১২ কোটি যা কিনা আগামী ২০০০ সাল নাগাদ ১৬ কোটি হতে পারে (বাংলাদেশ পকেট পরিসংখ্যান, ১৯৯৭)। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এখনও সর্বাধিক, প্রায় ২.১৭% ভাগ । অন্যদিকে এদেশের মানুষের বাৎসরিক গড় আয়

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত কম, মাত্র ২৫৪ ডলার (১৯৯৬-৯৭ সালে হিসাব অনুযায়ী) [৬] যা' কিনা বিশ্বের সর্বনিম্ন পর্যায়ভুক্ত। মোটকথা বাংলাদেশের বিপুল জনসংখ্যা সমস্যা এ দেশের অনেক সামাজিক সমস্যার জন্ম দিচ্ছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে পদে পদে বাধাগ্রস্থ করছে। যে কারনে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন ও পরিকল্পনা এখানে শুধু স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরন ও বিদেশ থেকে খাদ্য-ক্রয় খাতে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ গ্রামভিত্তিক দেশ। ৫৯,৯৯০টি গ্রামেই এদেশের শতকরা প্রায় ৯০ভাগ মানুষ বসবাস করে। এদেশে বয়স্ক শিক্ষার শতকরা হার ৫১% [৭]। এদেশে প্রায় ৭৮,৫৯৫ (১৯৯৬) টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। সরকারী হিসাবে যার মোট ছাত্রসংখ্যা ১,৭৫,৪০,০০০ (১৯৯৫-৯৬) জন কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দারিদ্র্যতার কারনে ও নানা সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারনে প্রায় প্রতি বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী তাদের পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে, ঝড়ে পড়ছে অমিত সম্ভাবনা। এই ঝড়ে পড়ার হার প্রাথমিক স্তরে শতকরা ৬২ ভাগ , মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১৫ ভাগ এবং উচ্চ শিক্ষা স্তরে শতকরা ৩ ভাগ [৮]।

বাংলাদেশের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবাখাত প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। এদেশে ৩৯৫টি গ্রাম্য স্বাস্থ্যকেন্দ্র সহ ৯৩৩টি হাসপাতাল রয়েছে। যার শয্যা সংখ্যা ৩৭,১৩১ টি। প্রতি ৪৯৫৫ জন লোকের জন্য ১ জন ডাক্তার রয়েছেন। প্রতি ৩২৮৮ জন লোকের জন্য হাসপাতালে শয্যা রয়েছে মাত্র১ টি। দেশে রেজিষ্টার্ড চিকিৎসকের সংখ্যা ২৪,৬৩৮ জন যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল ।

বাংলাদেশ তার জনগনের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরনেও সক্ষম নয়। এদেশের জনসংখ্যার $\frac{২}{৩}$ ভাগ অংশ পুষ্টিহীনতার শিকার । প্রতিবছর প্রায় ৫০,০০০ জন শিশু শুধুমাত্র ভিটামিন ''এ'' এর অভাবে অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিশু মৃত্যুর হার এদেশে প্রতি হাজারে ৬৭ জন (১৯৯৬)। যে সব শিশু বেঁচে থাকে তাদের $\frac{১}{৪}$ অংশ ৫ বছর বয়স পূর্ন হবার আগেই অকালে মারা যায় [৯]। এদেশের মানুষের গড় আয়ু ৫৯ বছর [১০]।

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের দিকে তাকালে আমরা যে সাধারন চিত্রটি পাই তা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। অনুন্নত গ্রামীন অঞ্চল বাদ দিয়ে শুধু মাত্র শহর অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেও দেখা যায়, এদেশের মানুষের বসবাস উপযোগী বাড়ী-ঘর ও সাধারন স্বাস্থ্য সেবার মান মোটেও উন্নত নয় । গ্রামের বেশীরভাগ মানুষই বাঁশ, কাঠ ও ছনপাতা দিয়ে তৈরী কাঁচা ঘরে বসবাস করেন। নিম্ন আয়ের জনসাধারন বিশেষতঃ গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির বাড়ীঘরের অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয় এবং সাধারন মানুষের বাসস্থান নির্মান ও পুনঃর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকারী পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। সরকারী পরিকল্পনাবিদদের পরিকল্পনায় রয়েছে শুধুমাত্র

Dhaka University Institutional Repository

শহরের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য সুরম্য অট্টালিকা তৈরীর পরিকল্পনা । গ্রামের সাধারন মানুষ এক্ষেত্রে বরাবরই অবহেলিত।

বাংলাদেশের অর্থনীতির শতকরা ৫৪ ভাগ জাতীয় উৎপাদনের অংশ (জি.ডি.পি.)আসে কৃষিখাত থেকে এবং এদেশের শতকরা প্রায় আশিভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ।এদেশে মোট চাষযোগ্য এলাকা ৩৩৪১৩ হাজার একর [১১]। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর দাড়প্রান্তে এসেও এখনো এদেশের কৃষিক্ষেত্রে মান্ধাতার আমলের চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে (লাঙ্গল-বলদের ব্যবহার)। আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ যন্ত্রপাতি ও উপকরন যেমন, ট্রাক্টর , পাওয়ার টিলার, রাসায়নিক সার, উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্যবীজ, সেচ ইত্যাদি ব্যবস্থা খুব অল্পসংখ্যক কৃষকই গ্রহন করেছে। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মানুষের জমির স্বল্পতা ও জমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্তির জন্য এসব আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সম্ভবপর হচ্ছেনা। দেখা গেছে প্রায় ৯৫ ভাগ কৃষি জমি এসব বৃহদাকার উৎপাদন ব্যবস্থার উপযোগী যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপযোগী নয় এবং বাকি ব্যবহার উপযোগী জমিও খন্ডিত হবার ফলে খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় নেই [১২]।

বাংলাদেশে এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, এদেশের শতকরা ৭৯.৪ ভাগ জনগোষ্ঠি দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে [১৩]। সত্য বলতে , প্রায় $\frac{৪}{৫}$ অংশ গ্রামীন জনগোষ্ঠি তাদের সর্বনিম্ন খাদ্য চাহিদা পুরনে অক্ষম [১৪] । পাশাপাশি গ্রামীন জনগোষ্ঠির বাকি $\frac{১}{৫}$ অংশ মানুষ যারা দারিদ্র্য সীমার উপরে বসবাস করছেন তারাই সমগ্র গ্রামীন আয়ের অর্ধেকটাই ভোগ করে থাকেন। গভীর ভাবে দেখলে দেখা যায় যে, গ্রামীন দারিদ্র্যতার মূলে দুটি প্রধান কারনই মূখ্যঃ ভূমিহীনতা ও কর্মসংস্থানের অভাব। ভূমির ক্ষেত্রে ভূমির অসম মালিকানা ও ত্রুটিপূর্ন ভূমি ব্যবস্থাই বৈষম্যর সৃষ্টি করছে [১৫] এবং এর অব্যবস্থা একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। অনুন্নত দেশে মূলতঃ সামন্তবাদী এবং আধা সামন্তবাদী ভূমি ব্যবস্থা বিরাজমান । প্রাক-বৃটিশ যুগে আমাদের এ অঞ্চলে ভূমির উপর কোন ব্যক্তি মালিকানা ছিলনা । তখন ভূমির মালিক ছিল রাষ্ট্র । যদিও ভূমির উপর কর্তৃত্ব করত প্রধানতঃ গ্রাম সমাজ। উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ জমির মালিকানা লাভ করত না। এ কারনে জমির হস্তান্তরও হতো না। প্রাচীন গ্রামীন সমাজে সাধারন মানুষ কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত এবং তাদের উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ ভূমি কর হিসাবে প্রদান করত। কিন্তু ইংরেজ আগমনের ফলে এই সরল ভূমি ব্যবস্থা বাধাগ্রস্থ হয় । ইংরেজ শাসনামলে বিভিন্ন বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাতে । সেই সংগে উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমি হস্তান্তর ও বিভক্তিকরনের পথ প্রশস্ত হয় । ভূমির উপর স্বত্বাধিকার বলে তৎকালীন জমিদারেরা প্রজাদের কাছ থেকে ভূমি কর আদায় করত এবং ভূমি উপরস্থ বিভিন্ন অধিকার ইজারা দিয়ে আদায় করতো অতিরিক্ত অর্থ । এ ব্যবস্থায় ঋনদানকারী মহাজনদেরও বেশ সুবিধা হয়। ভূমির উপর জমিদারদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এবং তৎকালীন

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থাপনায় বৃটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে কৃষকের সংগে এক নতুন উৎপাদন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের পর মূলতঃ বৃটিশ ভারতের প্রবর্তিত ভূমি ব্যবস্থাই কিছুটা রদবদলের মাধ্যমে বলবৎ থাকে। এতে করে সাধারন কৃষককুলের অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নাই । ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর ভূমির ক্ষেত্রে পূর্বতন অব্যবস্থাই বিরাজ করতে থাকে । মুজিব সরকার কর্তৃক গৃহিত পদক্ষেপও এক্ষেত্রে কোন উন্নয়ন সাধন করতে পারে নাই। পরবর্তীতে জিয়া সরকার, সাত্তার সরকার, এরশাদ সরকার, খালেদা জিয়া সরকার এমনকি আধুনা শেখ হাসিনার ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক ভূমি সংস্কারের পদক্ষেপ গৃহিত হওয়া সত্বেও দরিদ্র কৃষককুলের অবস্থার আজও তেমন কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। ভূমিহীন সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যহত রয়েছে এবং বিত্তশালী ও সাধারন উভয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ভূমির মালিকানা লাভের মনোভাব আজও অক্ষুন্ন রয়েছে [১৬]।

অন্য এক সমীক্ষা অনুসারে দেখা যায় যে, ১৯৬৩-৬৪ সালে মাত্র শতকরা ৫ভাগ মানুষ ''সত্যিকার দরিদ্র'' ছিল (এই সংজ্ঞা অনুসারে যারা নির্দেশিত শতকরা ৮০ ভাগ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহনে অক্ষম), এই অংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৮-৬৯ সালে হয় শতকরা ২৫ ভাগ এবং ১৯৭৫ সালে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে হয় শতকরা ৪১ ভাগ [১৭] বর্তমানে এর হার শতকরা ৫৪ ভাগ বলে অনুমান করা হয়। এসব পরিসংখ্যানগত তথ্যর ব্যাপারে মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু এর বিষয়াবলীর স্বরূপ খুব পরিষ্কার। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ জীবন যাত্রার নুন্যতম মানের নীচে বসবাস করছেন।

বাংলাদেশ তার জন্মলগ্নেই অনুন্নত অবকাঠামোগত ব্যবস্থা সম্বলিত দারিদ্র্যতাপূর্ন সনাতনী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছে। অনুন্নত কৃষিখাত, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, সেই সাথে বাড়তি পাওনা হিসাবে ১৯৭১ সালের নয় মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপতো ছিলই। স্বাধীনতার অব্যবহতি পরেই যুদ্ধবিদ্ধস্ত অর্থনীতির পূর্নঃগঠন ও যুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পুর্নঃবাসন কাজের খাতই ছিল সর্বাধিকার সুবিধাপ্রাপ্ত খাত । মোট কথা স্বাধীনতার পর প্রথম দেড় বছর সরকার যুদ্ধবিদ্ধস্ত দেশগঠন ও ক্ষতিগ্রস্থদের পুনঃবাসন কর্মে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই চরম প্রতিকুল পরিবেশেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়। এ পরিকল্পনায় একটি গুরুত্বপূর্ন উদ্দেশ্য ছিল প্রথাগত ও প্রযুক্তিগত জ্ঞাননির্ভর কৃষি ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে কৃষিখাতে আরো অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা [১৮]। ১৯৭৩ সালের ২৭শে নভেম্বর বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা গ্রহনের কথা ঘোষনা করেন এবং ১৯৭৩ সালে জুলাই মাসেই এটি কার্যকর করা হয়।এর আগে অবশ্য ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনীত হয়েছিল। যা হোক কৃষি উন্নয়ন ছাড়াও প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল একাধিক। এগুলো হল-

Dhaka University Institutional Repository

ক)জনগনকে দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়া। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেকার ও অর্ধবেকার জনসমষ্টির জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং ফলপ্রদ মূল্য ব্যবস্থা ও রাজস্বনীতি প্রয়োগ করে আয়ের সুষম বন্টনকরন।

খ) যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ পরিচালনা করা এবং তা ক্রমাগত অব্যহত রাখা। এই উদ্দেশ্য কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের অর্থনীতিকে প্রানবন্ত করে তোলা।

গ) পরিকল্পনাকালে জাতীয় উৎপাদন অন্ততঃ ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা। এতে তৎকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ২.৩ ভাগ ধরে নিয়ে জাতীয় উৎপাদনের হার স্থির করা হয় ৫৫ ভাগে।

ঘ) এই প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বছরে অন্তত ২৫ ভাগ মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়। আয়-বন্টন নীতি এমন ভাবে প্রনয়ন করার ব্যবস্থা করা হয় যাতে দরিদ্র লোকদের আয় ও ভোগ গড়পড়তা আয় ও ভোগ অপেক্ষা অধিক হয় এবং অধিক আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদের আয় ও ভোগ হ্রাস পায়।

ঙ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন, চাল, কাপড়, ভেষজ তেল, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতির উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং এগুলোর সরবরাহ নিশ্চিত করা। সেই সাথে এসব নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ করে মূল্য স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা।

চ) রাষ্ট্রায়ত্ব উৎপাদন ক্ষেত্রের সম্প্রসারনকরন এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরনের লক্ষ্যে সমস্ত প্রবিন্ধকতা দূরীকরন।

ছ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন করা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ থেকে ২.৮ ভাগে হ্রাস করা।

জ) খাদ্য স্বয়ংসম্পুর্নতা অর্জন করা এবং কৃষি ক্ষেত্রে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে গ্রামীন কৃষক-শ্রমিকদের শহরাভিমুখে গমন রোধ করা।

ঝ) জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকরন এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা। রপ্তানী বৃদ্ধি এবং আমদানীর দ্রব্যর বিকল্প উদ্ভাবন করে বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হ্রাস করা।

ঞ) শিক্ষা., স্বাস্থ্য, গৃহনির্মান, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করে অবহেলিত জনসমাজের জীবনে নুতন সম্ভাবনা সৃষ্টি করা এবং উন্নয়নখাতে ব্যয়-বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা।

ট) সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগের ব্যাপক সম্প্রসারন করা। যেসব এলাকায় আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে সেসব এলাকায় শ্রমিকদের গতিশীলতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া।

ঠ) বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ভাবধারার পরিবত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে পরিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমান ছিল ৪৪৫৫ কোটি টাকা। এরমধ্যে সরকারী খাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমান ছিল ৩৯৫২ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে এই

Dhaka University Institutional Repository

পরিমান ছিল ৫০৩ কোটি টাকা। সরকারী খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমান ছিল শতকরা ৮৯ ভাগ এবং বেসরকারী খাতে ছিল শতকরা ১১ ভাগ।

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি খাত বা সেক্টরের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এর মধ্যে ছিল কৃষি, শিল্প ও প্রকৃতিক সম্পদ। এই পরিকল্পনায় শ্রমভিত্তিক খাতের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখেই এতে কৃষি, শিল্প এবং প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে অধিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাত ওয়ারী বরাদ্দের দিকে তাকালে আমরা এই মতের সমর্থন দেখতে পাই।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারী বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	খাত সমূহ	সরকারী খাত	বেসরকারী খাত	মোট ব্যয়	শতকরা অংশ
১।	কৃষি ও পানি উন্নয়ন	১০৪১	২৬	১০৬৭	২৪%
২।	শিল্প	৭৩৮	১৩৯	৮৭৭	১৯.৭%
৩।	বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ	৫২২	-------	৫২২	১১.৭%
৪।	বৈষয়িক পরিকল্পনা ও গৃহ নির্মান	৩১৫	১৩৬	৪৫১	১০. ১%
৫।	যাতায়াত	৫২৮	৬৬	৫৯৪	১৩.৪%
৬।	যোগাযোগ	১১৪	-------	১১৪	২.৪%
৭।	শিক্ষা ও জনশক্তি	৩১৬	-------	৩১৬	৭.২%
৮।	স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যান	২২০	-------	২২০	৪.৯%
৯।	পরিবার পরিকল্পনা	৭০	-------	৭০	১.৬%
১০।	প্রশাসন	২৬	-------	২৬	০.৬%
১১।	বাণিজ্য	৬২	১০৮	১৭০	৩.৮%
১২।	বিবিধ	-------	২৮	২৮	০.৬%
	মোট ব্যয়	৩,৯৫২	৫০৩	৪,৪৫৫	১০০%

উৎসঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮), পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

বাংলাদেশের প্রথম পাচঁশালা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের উৎস ছিল মূলতঃ দুইটি- অভ্যন্তরিন উৎস এবং বৈদেশিক সাহায্য (পরিশিষ্টঃ ক-১১)[১৯]। প্রথম পাচঁশালা পরিকল্পনার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় ১৯৭৮ সালের ৩০শে জুন। এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে একে একটি অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ পরিকল্পনা বলে আখ্যায়িত করা চলে। দুভার্গ্যজনকভাবে ১৯৭৪ সালের আর্কস্মিক বন্যা পরিস্থিতির কারনে উদ্ভুত পরিস্থিতি এবং প্রচুর খাদ্য-শস্য আমদানীর কারনে এটি

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকরী হতে পারে নাই[২০]। এসব কারনে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দারুনভাবে ব্যহত হয়। বলা বাহুল্য যে, এই পরিকল্পনায় যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল সেসব নিসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কিন্তু বাস্তবে এই পরিকল্পনা তেমন সাফল্য লাভ করতে পারে নাই। বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন এই পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক গুলো হলো, -

১। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭২ সালের দ্রব্যমূল্যের মাত্রাকে ভিত্তিরূপে ধরে নিয়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই মূল্যমাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্তির ফলে ১৯৭৩-৭৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে সমগ্র দেশে মূল্য পরিস্থিতি মারাত্নক আকার ধারন করে। তা স্বত্বেও দেখা যায় যে, এই পরিকল্পনার কাঠামোগত কোন পরিবর্তন পরিকল্পনা কমিশন করে নাই ফলে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় নাই।

২। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয় বার্ষিক শতকরা ৫.৫ ভাগ হারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি অর্জিত হয় মাত্র শতকরা ৪ ভাগ হারে ।

৩। এ পরিকল্পনায় মাথাপিছু বার্ষিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয় শতকরা ২.৫ ভাগ হারে কিন্তু সমগ্র পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দেখা যায় যে মাত্র শতকরা ১.১ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

৪।এই পরিকল্পনায় বৈদেশিক নির্ভরশীলতা শতকরা ৬২.২ ভাগ হতে কমিয়ে শতকরা ২৭ ভাগে আনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যতঃ তা সম্ভব হয় নাই। পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দেখা যায় যে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৭৭ ভাগে পৌছেছে।

৫। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনেও ব্যর্থ হয়। ১৯৭৭-৭৮ সালে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৫৪ লক্ষ টন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা অর্জিত হয় মাত্র ১৩২ লক্ষ টন।

৬। শিল্প ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি আনয়নের লক্ষ্যে এই পরিকল্পনায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছিল বার্ষিক শতকরা ৭.১ ভাগ কিন্তু বাস্তবে তা অর্জিত হয় শতকরা ২ ভাগ হারে। তবে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়েছিল।

৭। এই পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদনের বার্ষিক হার শতকরা ৪.৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাবার লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩.৩ভাগ হারে।

এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যে কোন উন্নয়ন পরিকল্পনাই জাতীয় লক্ষ্য ও আর্দশের উপর ভিত্তিকরে প্রনীত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে এর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা কিন্তু বাস্তবে এই পরিকল্পনার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নি। এতে সরকারী খাতের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল ফলে বেসরকারী খাত দারুনভাবে উপেক্ষিত হয় তাছাড়া পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কোন যোগাযোগ ছিল না, অন্য দিকে জনগনের কাছ থেকেও তারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীকালে অর্ন্তবর্তীকালীন বিশেষ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। এই বিশেষ দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ ছিল ১৯৭৮-১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এই পরিকল্পনা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচীকে সামনে রেখে বিশেষভাবে গ্রহন করা হয়েছিল। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী ''প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সম্প্রতি সরকার যে, নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহন করেছেন, বিশেষভাবে মাননীয় প্রেসিডেন্টের ১৯দফা কর্মসূচীকে সম্মুখে রেখে এই দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে'' [২১]। এই ১৯দফার কিছু গুরুত্বপূর্ন দিক ছিল, প্রথমতঃ সকল সম্ভাব্য উপায়ে বাংলাদেশকে একটি আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিনত করা , দ্বিতীয়তঃ প্রশাসন ও উন্নয়ন কাজে জনগনের অংশগ্রহন নিশ্চিতকরন, তৃতীয়তঃ কৃষিখাত উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন, চতুর্থতঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরন ও স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরন।

এই দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৩,৮৬১ কোটি টাকা উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং তার মধ্যে সরকারী খাতে ৩,২৬১ কোটি টাকা ও বেসরকারী খাতে ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থের উৎস ছিল মূলতঃ দুটি- অভ্যন্তরীন সম্পদ এবং বৈদেশিক সাহায্য ও ঋন। এতে দেশীয় সম্পদ থেকে ১,৩০৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋন ও সাহায্য থেকে ২,২৯৬ কোটি টাকা সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মত দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি, শিল্প ও পানি সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং খাতওয়ারী বরাদ্দবন্টনের সময় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় (পরিশিষ্ট ক-১০)[২২]।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এ সময় অনুধাবন করেন যে, দারিদ্র্যতার মূল সমস্যা যথা- বেকারত্ব , অনুন্নত স্বাস্থ্য সেবা এবং নিরক্ষরতা এমনভাবে দেশকে বিপর্যস্ত করেছে যে, এ সব ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বদলে মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রনয়ন করেই সফলতা লাভ করা সম্ভব হতে পারে। এই উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-১৯৮৫) প্রনয়ন করা হয়।এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কিছু গুরুত্বপূর্ন দিক হলো- [২৩] ।

প্রথমতঃ মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে জীবনযাত্রার মান সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীতকরন। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নীতকরন। তৃতীয়তঃ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিকরন যাতে তারা নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরন করতে পারে। চতুর্থতঃ আত্মনির্ভরশীল কর্মসংস্থানের সুযোগসৃষ্টি , পঞ্চমতঃ সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য আয়, সম্পদ ও সুযোগের সুষম বন্টন, ষষ্ঠতঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য স্বল্পতম সময়ে খাদ্য স্বয়ংভরতা অর্জনের প্রচেষ্টা গ্রহন। পরিশেষে একথা বলা যায়, গ্রামের ৮৭ ভাগ জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য এই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছিলো [২৪]।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) এবং দ্বি-বার্ষিক (১৯৭৮-৮০) পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়সীমা ছিল ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলোর মিশ্র প্রতিক্রিয়ার পটভূমিতে এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আবির্ভাব। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট বরাদ্দের পরিমান ছিল ২৫,৫৯৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারী খাতে ২০,১২৫ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ৫,৪৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলে ঘোষনা করা হয়। এছাড়া নন্-মনিটাইজড খাতে ১,৭০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপঃ-

১। আপামর জনসাধারনের মৌলিক চাহিদা পূরন সাপেক্ষে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করন।

২। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজে জনগনের ব্যাপক অংশ গ্রহনের মাধ্যমে জীবন যাত্রার গুনগত উন্নয়ন সাধন করা।

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২.২৩ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, কর্মক্ষম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা ।

৪। মোট জাতীয় উৎপাদন (জি.ডি.পি) বার্ষিক শতকরা ৭.২ হারে বৃদ্ধি করা।

৫। মাথাপিছু বার্ষিক আয় শতকরা ৪.৯০ হারে বৃদ্ধি করা। এই হারে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলে গড় আয় দাড়াবে ২,৫১৫ টাকা।

৬। উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করা।

৭। কৃষি উৎপাদন শতকরা ৬.৩ হারে বৃদ্ধি করা। ধান ও গম উৎপাদন শতকরা ৭.১ হারে বৃদ্ধি করা এবং ১৯৮৪-৮৫ সালে ২০০০.৩০ লক্ষ টন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা।

৮। শিল্প উৎপাদন শতকরা ৮.৬ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা। ১৯৮৪-৮৫ সালের মধ্যে ১২০ কোটি গজ তুলা কাপড় উৎপাদন করা, যাতে মাথা পিছু ১২ গজ কাপড় উৎপাদিত হয়। জল সেচ ব্যবস্থার জন্য ৩৫ হাজার ডিজেল ইঞ্জিন, ৪৮.১০ হাজার পাম্প এবং ১৪.২৮ লক্ষ মেট্রিন টন সারের ব্যবস্থা করা ।

৯। বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন শতকরা ১৬.০ হারে বৃদ্ধি করা ।

১০। জনসাধারনের বাসস্থান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গৃহ নির্মান শতকরা ৪.২ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা হয়। ৩০ হাজার আধাপাকা স্বল্প মূল্যের বাড়ী এবং ১০ হাজার বহুতল বিশিষ্ট ফ্লাট নির্মান করা ।

১১। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতকরনের লক্ষ্যে ২০৫৮ মাইল উন্নতমানের নতুন রাস্তা নির্মান এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সংস্থার জন্য ৫০০টি ট্রাক ও ৪০০টি বাস আমদানী করা এই পরিকল্পনার লক্ষ্য হিসাবে ধরা হয়।

১২। শতকরা ৪০ ভাগ গ্রাম বিদ্যুৎতায়ন করা এবং এ ক্ষেত্রে সাফল্য রক্ষা করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। নিরক্ষরতা দূরীকরন কর্মসূচী ছিল এই পরিকল্পনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরীকরনের পাঁচ বছরের মধ্যে ১০ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত চার কোটি মানুষের নিরক্ষরতা দূরীকরন করা হবে বলে ঘোষনা করা হয় । তাছাড়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ১৯৮০-৮৫ সালের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন উপযোগী শতকরা ৯০ ভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠাবার পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

১৪। আয়, সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সুষম বন্টনের মাধ্যমে উন্নত সামজিক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করা ।

১৫। শ্রম সরবরাহের সঙ্গে মিল রেখে জনগনের জন্য কাজের সুযোগ বর্ধিত করা।

এই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংস্থান করতে গিয়ে বিপুল পরিমান বৈদেশিক ঋন গ্রহন করতে হয় (পরিশিষ্ট-ক ১১)[২৫]।দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল খুবই উচ্চাভিলাষী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর স্থিরীকৃত লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা চলা কালে প্রস্তাবিত ব্যয় ও লক্ষ্যসমূহ কাটছাট করে প্রায় অর্ধেক করা হয়। (পরিশিষ্ট-ক ১২) [২৬]।

পরিকল্পনা প্রনয়নের উদ্দেশ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে উৎপাদন নির্ভর পরিকল্পনা মূলতঃ কৃষি উন্নয়নকে ঘিরেই তৈরী হয়েছে। আজ প্রায় তিন দশক ধরে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য খাদ্য আমদানী কমানোর লক্ষ্যে কৃষি উৎপাদনের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেয়া হচ্ছে [২৭]। শিল্পায়নের দিকে পশ্চাদপদতার ফলে বেকারত্বের প্রসার ঘটে চলেছে [২৮], জীবন যাত্রার মান নিম্নগামী হচ্ছে, শিক্ষার হার নিম্নমুখী হচ্ছে অথবা যে রকম ভাবে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল তা হয়নি।

কৃষিপন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পদ্ধতির প্রচলন সর্বব্যাপি হয় নাই এবং অতীতের মত আজও কৃষি খাত প্রকৃতিনির্ভর ও প্রকৃতির খেয়ালখুশির উপর নির্ভরশীল। বন্যা খরা, সাইক্লোন আজো আগের মত মানুষ ও সম্পদের ক্ষতি করে চলেছে [২৯]। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন কার্যকর উপায় আজো গ্রহন করা হয় নাই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তেমন কোন উপায়ও আজো উদ্ভাবিত হয় নাই।

সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়ন কার্যক্রম চালানোর জন্য বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডারও অত্যন্ত সীমিত । প্রাকৃতিক গ্যাস [৩০] ছাড়াও বাংলাদেশে অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ন কয়েকটি অকৃষিজাত সম্পদ রয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি রাস্তাই খোলা রয়েছে , আর সেটি হলো এদেশের তিনটি প্রধান সম্পদ- জনশক্তি, ভূমি ও পানি যথাযথ ও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি ও নতুন কর্মের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। এই সম্পদ সমূহের মধ্যে শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের চাষযোগ্য জমিতে উৎপাদনের পরিমান ভারতের চেয়ে বেশী এবং অষ্ট্রেলিয়ার কৃষি উৎপাদনের

Dhaka University Institutional Repository

এক-চতুর্থাংশ [৩১]। এরই পরিপেক্ষিতে আমরা আরো বলতে পারি যে, বাংলাদেশের জমির উর্বরতা শক্তি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় এবং জলবায়ু ও আবহাওয়াগত কারনে এদেশের বেশ কয়েকটি কৃষি অঞ্চলে বছরে সহজেই তিনটি ফসল পাওয়া যায় [৩২]। যা সত্যিই বিশ্বের অন্যান্য অনেক দেশের থেকে ব্যতিক্রমধর্মী।

সস্তায় বিপুল শ্রমশক্তিকে কৃষি ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সত্বেও বাংলাদেশে প্রতি একরে ফসল উৎপাদন হয় খুবই কম। ভারতে গড়ে ধান উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশী। অন্যদিকে অষ্ট্রেলিয়া বাংলাদেশ থেকে চারগুন, জাপান তিনগুন এবং তাইওয়ান ও দক্ষিণ কোরিয়া দেড়গুন বেশী ফসল উৎপাদন করে [৩৩]। এর থেকে কৃষিক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার চিত্রই ফুটে উঠে। এরূপ ব্যর্থতা কৃষিক্ষেত্রের ভবিষ্যত সোনালী স্বপ্নকেও হুমকির সম্মুখীন করছে। প্রকৃতিনির্ভর সনাতনী কৃষি ব্যবস্থা ও সাধারন কৃষকদের অলসতাকে এরজন্য দায়ী করা যায়। বাংলাদেশের মানুষের দারিদ্র্যতা এবং এদেশের মাটির অসাধারন উর্বরতা শক্তি লক্ষ্য করে ফরাসী কৃষি অর্থনীতিবিদ রেন ডুমন্ট মন্তব্য করেছেন, ''সত্যি বলতে গেলে এ কথাই বলতে হয় যে, বাংলাদেশের মাইলের পর মাইল কৃষিযোগ্য জমি ভারত, চীন ও জাপান থেকে বহুগুন বেশী উর্বর। এখানকার ফসলী মাটির উর্বরতা, বৈশিষ্ট্যাবলী ও বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের গড় পরিমান পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের থেকেও বেশী। এদেশের আবহাওয়ায় চীন এবং জাপানের মত প্রচন্ড শীত অনুপস্থিত। বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন শুধুমাত্র ব্যপক পরিচিত সনাতন পদ্ধতি প্রয়োগ করেই দ্বিগুনহারে বৃদ্ধি করা যায়। বহুমূখী শস্যর আবাদ, বিভিন্ন ধরনের ফসলের চাষ, জল মহাল বা মৎস্যখামারের সঠিক উন্নয়ন, পাহাড়ী অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, সব্জিচাষ, হাস-মুরগী এবং গবাধিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এই দেশে এটি করা সতব'' [৩৪]। আধুনা বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ননীতি ও পরিকল্পনাসমূহ কৃষিখাতকে বিপুলভাবে আন্দোলিত করেছে [৩৫]। প্রথমতঃ সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫)শেষ বছরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জনের লক্ষ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে সেচের সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেয়া হয়। এতে ১৯৭৯-৮০ সালের ৩৬ লক্ষ একর থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল নাগাদ মোট পাঁচ বছরে দ্বিগুন হারে সেচ সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ এতে অর্থকরী ফসল যেমনঃ পাট, তুলা, আখ, ইত্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি করে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরন করেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পরিকল্পনা করা হয়। তৃতীয়তঃ মানুষের খাদ্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে শাক-সব্জী ও ফলমূল বিশেষ করে ডাল ও রবিশস্যর উৎপাদন বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা করা হয়। চতুর্থতঃ অভ্যন্তরীন বাজারের স্থিতিশীলতা রক্ষাকল্পে ধান ও গমবীজ ক্রয়ে কৃষকের জন্য ভর্তুকীর ব্যবস্থাকরন। পঞ্চমতঃ কৃষকের লাভের জন্য কৃষি ক্ষেত্রে সহায়তা কর্মসূচী বৃদ্ধিকরন। ষষ্ঠতঃ ঋন সুবিধা বৃদ্ধিকরন এবং সর্ব্বোপরি, (ক) জমি চাষের পদ্ধতি উন্নয়ন (খ) বন্যা নিয়ন্ত্রন, সেচ ও পানি নিষ্কাষন পদ্ধতির বিস্তৃতিকরন (গ) সেচ সুবিধা প্রাপ্ত ও সেচ সুবিধা

Dhaka University Institutional Repository

বঞ্চিত অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের উন্নত সব্জীবীজের সাহায্যে চাষাবাদ বৃদ্ধিকরনের মাধ্যমে [৩৬]। কৃষিক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তনের প্রয়াস গ্রহন করা যায়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে ১৯৮৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর সরকারীভাবে ৩৮৬০০ কোটি টাকার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) ঘোষনা করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়ের এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে পরিকল্পনা মন্ত্রী ব্যারিষ্টার সুলতান আহমেদ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা ঘোষনা করেন [৩৭]। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপঃ

১। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, ২। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ৩। শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন, ৪। প্রযুক্তি বিদ্যার বিকাশসাধন, ৫। খাদ্যে স্বয়ংভরতা অর্জন, ৬। সাধারন মানুষের মৌলিক চাহিদাপূরন, ৭। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করন, ৮। স্বনির্ভরতা অর্জন, ৯। পরিকল্পনা বলবৎকালীন সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা শতকরা ৫৪.৫ ভাগে স্থিরীকরন। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বৈদেশিক সাহায্য ক্ষেত্রে নির্ভরতা ছিল যথাক্রমে শতকরা ৭৭ ভাগ ও শতকরা ৫৮ ভাগ, ১০। দারিদ্র্য মোচন করা, ১১। ৪৬০টি উপজেলার অবকাঠামো ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ পরিকল্পনায় ২,২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৮,৬০০ কোটি টাকার মধ্যে ২৫,০০০ কোটি টাকা সরকারীখাতে এবং ১৩,৬০০ কোটি টাকা বেসরকারীখাতে বরাদ্দ রাখা হয়। এতে অভ্যন্তরীন খাত থেকে ১৭,৫৭২ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে ২১,০২৮ কোটি টাকায় সংস্থান করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়কালে (১৯৮৫-৯০) বাংলাদেশের প্রায় সব সেক্টরে প্রচুর পরিমান কাজ সম্পন্ন করা হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫) প্রনয়ন করেন।এতে মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমান ছিল ৬৮,৯৩০ কোটি টাকা। তার মধ্যে সরকারী খাতে ৪১,৯৩০ কোটি টাকা ও বেসরকারী খাতে ২৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

বাংলাদেশে আমলাদের মাধ্যমে উন্নয়নের যে সব পরিকল্পনা এ যাবৎকাল গৃহিত হয়েছে তাতে বিভিন্নক্ষেত্রে ভর্তুকী প্রদানের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে [৩৮]। বর্তমান সময়ে কৃষককে উৎপাদনে উদ্বুদ্ধকরনের জন্য ভুর্ত্তকী প্রদান করা হয়ে থাকে। তাছাড়া কৃষককে প্রদত্ত কৃষিঋণ শুধুমাত্র কৃষি সম্প্রসারনের জন্যই দেয়া হয়না বরঞ্চ বিরাজমান কৃষি ব্যবস্থায় অবকাঠামোর আধুনিকীকরনের জন্যও দেয়া হয় [৩৯] এলক্ষ্যে কৃষি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাকে এই মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন জমির মালিকদেরকে এমনভাবে সম্ভব সকল সহায়তা করেন যাতে করে কৃষকেরা সত্যিকার অর্থে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারেন [৪০]।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কয়েক বছর যাবৎ কৃষকদের মধ্যে সরকারী উদ্যোগে নায্যমূল্যে রাসায়নিক সার বিতরন করে আসছেন ১৯৯৫-৯৬ সালে সার বিতরন ও রপ্তানীর পরিমান ছিল ২১৮৫০০০ মেট্রিক টন পূর্বে এখানে ১৯৯১-৯২ সালে ছিল ২১২৩০০০ মেট্রিক টন [৪১] । কৃষকের জন্য নায্যমূল্যে উচ্চফলনশীল জাতের বীজেরও সরবরাহ নিশ্চিতকরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমান অর্থ ব্যয় করা হয়। স্বাধীনতার অব্যবহতি পরে ১৯৭২-৭৩ সালে পাওয়ার পাম্প, টিউবওয়েল, খাল খনন ইত্যাদি সেচের সবরকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ২৯৯৩০০০ একর জমি সেচের আওতায় আনা হয় পরবর্তীতে ১৯৯০-৯১ সালে এটি বৃদ্ধি পেয়ে ৭৪৭৯০০০ একরে উন্নীত হয়। বিগত ১৯৯৫-৯৬ সালে আরো বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৮৭২০০০ একর [৪২]। কৃষিখাতে ১৯৯২-৯৩ সালে সরকারী রাজস্ব বরাদ্দ ছিল যেখানে ২৬৫৯ মিলিয়ন টাকা সেটি বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে হয় ৩০৬২ মিলিয়ন টাকা [৪৩]। এসব কারনে কৃষি উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পায় তাতে বাংলাদেশ ''তলাবিহীন ঝুড়ি''র বদনাম ঘুচাতে সক্ষম হয় [৪৪]। গ্রামীন সমাজ উন্নয়নের জন্য সরকার গৃহীত উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে ''রুরাল ওয়াকস প্রোগ্রাম'' বা ''গ্রামীন কার্যকর্মসূচী'' (আর.ডাব্লিউ.পি.) এবং '' ফুড ফর ওয়ার্কর্স'' বা ''কাজের বিনিময়ে খাদ্য'' (কাবিখা) কর্মসূচী উল্লেখযোগ্য। এ সকল কর্মসূচীসমূহ ষাটের দশকের দিকে আরম্ভ করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ পরবর্তী সময় থেকে ''কাবিখা'' কর্মসূচী অত্যন্ত জোরালোভাবে চালুকরন করা হয়। এই কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো, গ্রামীন অবকাঠামো: যেমন- রাস্তাঘাট নির্মান, বাধ নির্মান, খাল খনন ইত্যাদির পাশাপাশি শুষ্ক মৌসুমে গ্রামীন সাধারন দরিদ্র জনগনের জন্য আরও কাজের ব্যবস্থা করন। এই উপরোক্ত প্রকল্প দুইটি গ্রামীন ভূমিহীন কৃষক, কর্মহীন শ্রমিক ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য সরকার গৃহিত একটি উল্লেখযোগ্য কল্যানমুখী পদক্ষেপ [৪৫]। এই ''কাজের বিনিময়ে খাদ্য'' কর্মসূচীর আওতায় ১৯৭৬০৭৭ অর্থবছরে ২১,৬৬ মাইল খাল খনন ও খাল পুনঃখনন করা হয় এবং ৯০০ মাইল কাঁচা রাস্তা তৈরি করা হয়। এতে ১৯৭৬-৭৭ সাল নাগাদ ২৩,২৮ মাইল খাল খনন করা হয় এবং ৩৯৭৯ মাইল কাঁচা রাস্তা মেরামত ও পুনঃনির্মান করা হয় [৪৬]। সর্বোপরি এই সব প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীন দরিদ্র মানুষ শুষ্ক মৌসুমে কাজ, খাদ্য ও অর্থের সংস্থান পেয়ে থাকে। একটি বিদেশী সংবাদপত্র এ সব কাজের সুফল লক্ষ্য করে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করে '' বাংলাদেশে আবার নতুন করে প্রানের স্পন্দন শুরু হয়েছে'' [৪৭]। তবে বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী উন্নয়ন কৌশলের ধারাবাহিকতা ও পরিকল্পনা সমূহ বাধাগ্রস্থ হয় মূলতঃ এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুধাবিভক্ত কৃষি জমির অসম ঘন্টনের জন্য [৪৮]। তাছাড়া পরিকল্পনা প্রনয়নকারীদের বাস্তববর্জিত প্রকল্প সমূহের জন্যও বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকে।

গ্রামীন দারিদ্র্যতা দুর করার জন্য সনাতনী কৃষি ব্যবস্থায় কৃষককে কৃষি ঋন, সামান্য কিছু কারিগরী সহায়তা দিয়ে বড় ধরনের কোন সাফল্য লাভ করা যায় না । এদিকের গুরুত্ব বুঝতে পেরে সরকার স্থানীয় পর্যায়ে কৃষিসেবা বৃদ্ধির দিকে জোর দেন। এ লক্ষ্যে সরকার প্রথমবারের মত

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়ন কৃষি সহকারী (ইউ.এ.এ) নিয়োগ করেন । প্রত্যেক ইউনিয়নে দুইজন ইউনিয়ন কৃষি সহকারী নিয়োগ দেয়া হয়। বাংলাদেশে প্রতিটি ইউনিয়নকে দুইটি জোন বা কৃষি অঞ্চলে (ব্লক) ভাগ করে প্রতিটি কৃষি জোন বা অঞ্চলের দায়িত্বভার দেয়া হয় একজন ইউনিয়ন কৃষি সহকারী বা ''ইউনিয়ন এগ্রিকালচার এসিসটেন্স'' এর হাতে । এসব ইউনিয়ন কৃষি সহকারীরা স্থানীয় জনসাধারনকে বিশেষতঃ কৃষকদেরকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ, অধিক শস্য উৎপাদন, মাছ চাষ, গবাধিপশু পালন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষন দিয়ে থাকেন। কৃষকেরা এসব ইউনিয়ন কৃষি সহকারীদের কাছ থেকে বিভিন্ন শস্য উৎপাদনে মাটির গুনাগুন, সঠিক উপায়ে সার ও বীজের ব্যবহার, বীজ সংরক্ষন, জমিতে সারের যথার্থ প্রয়োগ, প্রাপ্ত কৃষি ঋন কাজে লাগানোর কৌশল সমূহ শিক্ষা দেয়। এছাড়া কৃষকদের সুবিধার্থে কীটনাশক ছিটানোর মেশিন, আগাছা দমন যন্ত্র, বীজ বপন যন্ত্র, কোদাল ইত্যাদি ছোট-খাট কৃষি যন্ত্রপাতি ইউনিয়ন কৃষি সহকারীরা কৃষকদের মাঝে বিতরন করে থাকেন। সরকারী এসব উন্নয়ন প্রচেষ্টার পাশাপাশি বহু বেসরকারী সংস্থা (এন.জি.ও) থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তাদের কর্মচারীদের উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত রেখেছে। এদের মধ্যে আছে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মাঠকর্মী, সমাজ কল্যান সংগঠন, গনস্বাস্থ্য কর্মী ইত্যাদি। সরকারও জনগনের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত বিশাল কর্মীবাহিনী নিয়োজিত করেছে। বিভিন্ন এলাকাভিত্তিক মডেল প্রকল্পও সরকার চালু করেছে। সরকারী এসব কৌশলের ফলে নির্বাচিত কিছু মডেল এলাকার জমির মালিক, কতিপয় কৃষক উপকৃত হয় একথা সত্য , কিন্তু এতে করে সমগ্র দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিপুল দারিদ্র্যতা ও গ্রামীন সমাজের বৈষম্য দূরীভূত হচ্ছেনা । এসব ব্যবস্থা পরীক্ষামূলক ভাবে মডেল প্রকল্পের মাধ্যমে কোথাও চালু করতে গেলে দেখা যায় যে, গ্রামীন ধনীক শ্রেনী ও মধ্যস্বত্বভোগী ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের হাতেই এসবের সুফল চলে যায় এবং সাধারন দরিদ্র মানুষ আরো শোষনের শিকার হয় [৪৯]।

বাংলাদেশে কোন উন্নয়ন কার্যক্রমকে সত্যিকারভাবে পরিচালিত করতে হলে, গ্রামীন এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে কৃষি উন্নয়নের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা, কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমেই গ্রামীন দারিদ্র্যতা বিমোচন সম্ভব হতে পারে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা ও প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকারের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে আমলারা কখনোই সহযোগীতা করে নাই। বৃটিশ আমলে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের (আই.সি.এস) অফিসারেরা কর্মস্থলে যোগদান করেই তৎকালে বিদ্যমান স্থানীয় সরকারের উপর বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে তাদের পরিপূর্ণ কতৃত্ব বজায় রাখতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বে তৎকালীন পাকিস্তান আমলের সি.এস.পি এবং ই.পি.সি.এস অফিসারেরাও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের বি.সি.এস ক্যাডারের অফিসারেরাও উপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ধ্যান-ধারনায় চালিত হয়ে নিজেদেরকে সাধারন জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেই বেশী পছন্দ করেন। সরকারী উচ্চ নীতিনির্ধারক মহল এমনকি সংসদীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতেও আমলাতন্ত্রের দেয়া তথ্যাবলী ও তাদের প্রস্তুতকৃত দলিল দস্তাবেজের উপর ভিত্তি করেই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব বিবর্জিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গবেষক কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞান ও নিরলস গবেষনা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশমালা প্রায় ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের স্বার্থের পরিপন্থী হয় বলে আমলারা এসব প্রত্যাখ্যান করে কিংবা সুকৌশলে এসব এড়িয়ে যায়। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব এদেশের অবউন্নয়নের জন্য অনেকাংশে দায়ী । আমলাদের মনোভাবই জনগনকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনে নিরুৎসাহিত করে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের সুফল লাভে জনগনকে বঞ্চিত করে [৫০]। ইউনিয়ন পরিষদের উপর অমলাতন্ত্রের অত্যাধিক খবরদারী এর প্রকৃষ্ট উদাহরন। সরকার আমলাদের এ মনোভাব উপলব্ধি করেই গ্রামীন উন্নয়নে আমলাদের আগ্রহশীল করতে এবং গ্রামীন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সুষ্ঠূভাবে পরিচালনা করার উপায়, উদ্দেশ্য সর্ম্পকে ধারনা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সালে এক অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী গঠন করেছে [৫১]। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লা জেলার কোঠবাড়িয়ায় স্থাপন করা হয়েছে এবং এই অধ্যাদেশের ৮ ধারায় একাডেমীর কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে, এই একাডেমী পল্লী উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষন দেবে , গবেষনা কার্যক্রম চালাবে ইত্যাদি।সরকার কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে ''কৃষিভিত্তিক শিল্প ও প্রযুক্তি উন্নয়ন প্রকল্প'' (এ.টি.ডি.পি) কৃষি মন্ত্রণালয় এবং আর্ন্তজাতিক সার উন্নয়ন কেন্দ্র (আই.এফ.ডি.সি) এর যৌথ প্রচেষ্টায় গৃহিত একটি প্রকল্প । বাংলাদেশ সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউ.এস.এ.আই.ডি) যৌথভাবে এই প্রকল্পে অর্থায়ন করছে। বাংলাদেশের জনগনকে কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় পরিচালনায় সহায়তা প্রদানই এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য । কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত ব্যবসায় উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও উৎসাহ প্রদান করাই এ.টি.ডি.পির লক্ষ্য । এ.টি.ডি.পি তার মেয়াদ কালে (১৯৯৫-২০০০) বেশ কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহন করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে কৃষি ব্যবসা ঋন তহবীল (এ.সি.এফ) যা কিনা কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ, চলতি মুলধন এবং ব্যবসা পরিচালনায় অর্থায়নের জন্য তহবীলের যোগান দেবে। আধুনিককালে কৃষকেরা উন্নত প্রযুক্তির উপর ক্রমান্বয়ে আগ্রহশীল হয়ে উঠছে। এ দিকটা লক্ষ্য রেখে এ.টি.ডি.পির '' ষ্ট্যাম্প'' বা প্রযুক্তি আহরন ও দক্ষতা অর্জনের সহায়ক কর্মসূচীটি উল্লেখযোগ্য । সর্বোপরি বাজার ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য প্রদান কর্মসূচী বৃহৎ ও মাঝারী পর্যায়ের শিক্ষিত কৃষককে আধুনিক কৃষি তথ্য পেতে উৎসাহ জোগাবে। তবে এসব প্রকল্পে মুলত ঃ বৃহৎ পর্যায়ের কৃষক ও কৃষি পন্য শিল্পের মালিকেরা উপকৃত হবে এবং এদেরকে লক্ষ্য করেই এই প্রকল্পটি প্রনীত হয়েছে। সরকার এ ব্যবস্থার সুফল ইউনিয়ন পর্যায়ে পৌছে দিলে সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নে সাড়া পড়তে পারে। তবে সরকারী প্রকল্পের আমলানির্ভর চরিত্রও এই প্রকল্পের কাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমান সরকার সামগ্রিক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ [৫২] কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্যে নায্যমূল্য সার, সেচ যন্ত্রপাতি, ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ ঋন ও ভতুর্কির ব্যবস্থা গ্রহন করার কথা সরকার ঘোষনা করেছেন। তাছাড়া ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্দোবস্তকরন, ভূমি সংস্কার ও ভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার দিকে সরকার সজাগ দৃষ্টি রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই সাথে মৎস্য গবাধিপশু খামার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। সরকার স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতা মূলক প্রশাসন গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরনের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর দিকে তাকালে দেখা যায়,বাংলাদেশে উন্নয়নখাতে যে পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে তার অনেকাংশই কাজে লাগানো হয় না। অন্যদিকে বাংলাদেশে যে পরিমান প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তিতে হাতে নেয়া হয় তার বেশীর ভাগই সম্পূর্ণ হয় না । ১৯৮৬-৮৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন খাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে ছিলো ৪৫১৩ কোটি টাকা কিন্তু এই একবছরে উন্নয়নখাতে খরচ হয় ৪৪৩৯ কোটি টাকা। বাকী ৭৪ কোটি টাকা সরকারের হাতে থেকে যায়। এই সময়ে গৃহিত ৮৪২টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ১০৮টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়। এর ঠিক দশ বছর পরে এসেও একই চিত্র পাওয়া যায়।

১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ রাখা হয় ১১৭০০ কোটি টাকা কিন্তু এই সময়ে কাজ হয় ১১০৪১ কোটি টাকার অর্থাৎ বাকী ৬৫৯ কোটি টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় ফেরত যায়। অন্যদিকে ১৯৯৬-৯৬ অর্থ বছরে প্রকল্প গৃহিত হয় ১২২৭টি কিন্তু কাজ সম্পন্ন হয় মাত্র ১৮৮টি প্রকল্পের [৫৩] অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ১০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়। এর থেকে বাংলাদেশের উন্নয়নের চালচিত্র সহজেই অনুমেয়। এদেশে উন্নয়নের যে চিত্র আমরা বিভিন্ন সরকারী পরিসংখ্যান ও জরীপের মাধ্যমে পেয়ে আসছি তার বেশীর ভাগ অংশের সঙ্গেই বাস্তবের মিল খুবই কম। সরকারী উন্নয়ন হচ্ছে কাগজে কলমে। সরকারী পরিসংখ্যানের পাতায় উন্নয়নের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় তার অধিকাংশই অলীক-অসাড় হিসাবের চমক। আনাড়ী ও অভিজ্ঞতাহীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যখন এই আমলাদের হাতের তৈরী চমৎকার কথামালার নীতি ও আর্শ্চয্য উন্নয়নের সহজ পরিসংখ্যান চিত্র দেখেন তখন তারা পুলকিত হন এবং জনগনের মঙ্গল কাজে নিয়োজিত থাকার আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। পক্ষান্তরে আমলাদের সরবরাহকৃত ভুল তথ্য রাজনীতিবিদদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনে বাধাগ্রস্থ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের অজ্ঞাতসারে জনগনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং একসময়ের প্রবল জনপ্রিয় এসব নেতৃবৃন্দ জনরোষের শিকার হন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার সুক্ষ্ম কুট-কৌশলের কাছে রাজনৈতিকদের এভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রতি পদে পদে পরাজয় বরন করতে হচ্ছে আর এর দুর্ভোগ পোহাচ্ছে এদেশের আপামর জনসাধারন।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকা

১) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997 (Dhaka: Ministry of Planning ,Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998),পৃষ্ঠা-৩৭

২) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৭

৩) ১৯৭৭ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সম্মেলনে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির বক্তব্য। দেখুন, The Bangladesh Times (Dhaka), 13 April,1977.

৪) ডঃ হাসানুজ্জামান, আর্থ-সামজিক বিকাশঃ বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ বাংলাদেশ ও তৎকালীন বৃটেনের মধ্যকার সম্পর্ক, (ঢাকাঃ নলেজ ভিউ , ১৯৮২), পৃষ্ঠা-৪৪

৫) পরিশিষ্ট ক(৪) দেখুন

৬) পরিশিষ্ট ক(৫) দেখুন

৭) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997 (Dhaka: Ministry of planning ,Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা-৩৪০, আরো দেখুন,Child Education and Literacy Survey, 1997, Primary and Mass Education Division, Government of Bangladesh.

৮) স্কুলের হাজিরা খাতায় প্রাপ্ত তথ্য অনেক সময় সঠিক হয়না। কেননা স্কুল কতৃপক্ষ অর্থনৈতিক সাহায্য ও সরকারী অনুদান পাবার জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী দেখিয়ে থাকেন। দেখুন, World Development Report, 1983.

৯) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997 (Dhaka: Ministry of planning ,Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা-১৫১, আরো দেখুন পরিশিষ্ট ক (৬)

১০) দেখুন,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৪৫, আরো দেখুন পরিশিষ্ট ক (৭)

১১) পরিশিষ্ট ক(৮)

১২) দেখুন, Azizur Rahman Khan, The Economy of Bangladesh, (London: Macmillan, 1972) পৃষ্ঠা-৪১-৪২,এই তথ্যটি ১৯৬০ সালে কৃষি সুমারী থেকে প্রাপ্ত।

১৩) দেখুন, Salimullah and Shamsul Islam, "A Note on Conditions of Rural Poor in Bangladesh," The Bangladesh Development Studies, vol. iv, No.2, April, 1976.

Dhaka University Institutional Repository

১৪) দেখুন,Lincoln Chen, an Anlysis of Per Capita Foodgrain Availability Consumption and Requirement in Bangladesh. (Dhaka: Ford Foundation Report no 24, 1974), আরো দেখুন, J.R. Tenant, " Food Policy Conflicts in Bangladesh", World Development Report, Vol-X, No-2, 1982, পৃষ্ঠা- ১০৩- ১১৩

১৫) দেখুন,Gunnar Myrdal, Economic Theorey and Underdeveloped Regions (Bombay: Vora and Co. ,1958), পৃষ্ঠা-২৩-২৪

১৬) দেখুন, F. Tomasson Jannuzi and James T. Peach, Bangladesh : A Profile of the Country Side (Washington D.C. : The United States Agency for International Development , April, 1979) , পৃষ্ঠা- ১১, আরো দেখুন,The New Nation (Dhaka), 21 January , 1979.

১৭) লেখুন, Azizur Rahman Khan , " Proverty and Inequality in Rural Bangladesh" , in Proverty and Landness in Rural Asia,(London: Macmillan Co., 1972),পৃষ্ঠা- ১৩৭- ১৫৩

১৮) লেখুন, , Government of Bangladesh,The First Five Years Plan 1973-74 (Dhaka: Planning Commission , November, 1973)

১৯) দেখুন,পরিশিষ্ট ক(৯)

২০) ১৯৭৪ সালের আকস্মিক বন্যার ফলে দেশের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ভূমির (২২,০৪২ বর্গমাইল) পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। পরিকল্পনায় কমিশনের হিসাবে ক্ষতির পরিমান ছিল প্রায় ৫৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বন্যার পরবর্তী পর্যায়ে তাৎক্ষনিক ভাবে খাদ্য শস্য আমদানীর জন্য প্রয়োজন ছিল প্রায় ১৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পুর্নবাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল ১৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, Frank Long , " The Impact of Natural Disaster on Third World Agriculture: An Exploratory Survey of the Need for some New Dimentions in Development", The American Jaurnal of Economics and Sociology , Vol-37, No-2 April, 1978, পৃষ্ঠা- ১৪৯- ১৬৩

২১) বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৭৮ - ১৯৮০, চলচিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ , তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দ্রষ্টব্য।

২২) দেখুন পরিশিষ্ট ক(১০)

২৩) দেখুন, Government of Bangladesh,The Second Five Years Plan 1980-85 (Dhaka: Planning Commission , December, 1980)

Dhaka University Institutional Repository

২৪) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Year Book of Bangladesh 1981 (Dhaka: Ministry of planning ,Bangladesh Bureau of Statistics, September, 1981), পৃষ্ঠা-৫৭৮

২৫) দেখুন পরিশিষ্ট ক(১১)

২৬) দেখুন পরিশিষ্ট ক(১২)

২৭) দেখুন, Rajni Kothari, " The Political Economic of Employment ", Social Change, Vol-3,No-3&4, September – December, 1973, পৃষ্ঠা-৪-৮

২৮) দেখুন, Rajni Kothari, প্রাগৃক্ত, পৃষ্ঠা-৪-৮

২৯) প্রায় প্রতিবছরই বাংলাদেশে বন্য ও ঘুর্ণীঝড় আঘাত হেনে থাকে। উপকূলীয় অঞ্চলে সংগঠিত ঘুর্ণীঝড় ও সাইক্লোনে বাতাসের গতিবেগ সাধারনত ১০০ মাইল বা তার বেশী হয়ে থাকে। এতে উপকূলীয় অঞ্চলে জান মালে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হয়। ১৯৬০-১৯৭৪ সালের মধ্যে এরকম ৭টি বড় ধরনের দূর্ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯১ সালের ঘুর্ণীঝড় ও ১৯৯৮ সালের দীর্ঘ নেয়ালীর প্রলয়ংকারী বন্যায় দেশের অর্থনীতি মারাত্নক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

৩০) বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত।তবে গ্যাস ও তেল পাবার সম্ভবনা উজ্জল। সরকার সারা দেশকে ৯টি ব্লকে ভাগ করে বিদেশী কোম্পানীর সংগে ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান কাজে সহযোগিতা চুক্তি করেছেন।

৩১) দেখুন,Rene Dumont , A self Relient Rural Development Policy for the Poor Peasantry of Sonar Bangla, (Dhaka: Mineographed, 1973), পৃষ্ঠা-৭১

৩২) দেখুন,A.H.M Aminur Rahman, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩১

৩৩) দেখুন, A.H.M Aminur Rahman,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩১

৩৪) দেখুন, Rene Dumont, A self Relicnt Rural Development Policy for the Poor Peasantry of Sonar Bangla, (Dhaka: Mineographed, 1973), পৃষ্ঠা-৭১, আরো দেখুন, Rene Dumont& Nicholas Cohen, The Growth of Hunger: A New Politics of Agriculture (London: Marion Boyars, 1980) পৃষ্ঠা-৭৬-৮১

৩৫) দেখুন, Government of Bangladesh, Procedure for Processing of Development Projects in The Public Sector (Dhaka: Planning Commission , July 1982)

৩৬) দেখুন, A.H.M Aminur Rahman,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩২

৩৭) দৈনিক ইত্তেফাক, ১৯৮৫, ৪ঠা ডিসেম্বর

৩৮) এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের সংগে ৬০ দশকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের উন্নয়ন কৌশলের মধ্যে বিশেষ তেমন কোন পার্থক্য

Dhaka University Institutional Repository

নাই।দেখুন,Emajuddin Ahmed, " Development Strategy in Bangladesh", Asian Survey, Vol-xviii, No-2 , November 1978,পৃষ্ঠা- ১১৬৮- ১১৮০

৩৯) দেখুন, A.H.M Aminur Rahman, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩২

৪০) দেখুন, A.H.M Aminur Rahman, প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৩

৪১) দেখুন, , Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997 (Dhaka: Ministry of Planning ,Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998),পৃষ্ঠা-২০১

৪২) দেখুন,পরিশিষ্ট ক(১৩)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আরো দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997 (Dhaka: Ministry of planning ,Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা-২০১

৪৩) দেখুন, পরিশিষ্ট ক(৪), আরো দেখুন, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997,পৃষ্ঠা-২৮৯

৪৪) দেখুন,Peter J.Bertocci, " Rural Development in Bangladesh: An Introduction" , In Robert D. Stevens , (Eds), Rural Development in Bangladesh & Pakistan (Honolulu : The University Press of Hawaii, 1976), পৃষ্ঠা-৩

৪৫) দেখুন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৩

৪৬) দেখুন,Government of Bangladesh, Bangladesh: Forthnightly Bulletin (Dhaka: 15 December , 1976)পৃষ্ঠা-৩

৪৭) দেখুন, The Sunday Observer (London: 7 November , 1976)

৪৮) দেখুন,F.Tomasson Jannnuzi and James T. Peach , Report on the Hierarchy of Interest in Land in Bangladesh (Washington D.C.: The United State Agency for International Development , 1977),পৃষ্ঠা-৭৬। সামাজিক বৈষম্যের চিত্র পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করার জন্য আরো দেখুন, R. Dahrendorf " On The Origin of Inequality among Men" , In Andre Betille (ED) , Social Inequality : Selected Readings (London: Penguin Education , 1969)পৃষ্ঠা- ১৬-৪৪

৪৯) দেখুন, A.H.M Aminur Rahman,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৪

৫০) দেখুন, A.H.M Aminur Rahman,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৫

৫১) দেখুন, Government of Bangladesh, Bangladesh Gezette (Ext), (Dhaka: 9 July, 1986)

Dhaka University Institutional Repository

৫২) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৫-৩৭

৫৩) দেখুন, Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997,প্রাগুক্ত,পৃষ্ঠা-৩৮৯,এছাড়া পরিশিষ্ট ক(১৫) দেখুন

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়- ৪

মধুখালী থানায় ইউনিয়ন ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সর্বনিম্ন ইউনিট বা স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। ১৯৮৩ সালের স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশের আওতায় গঠন করা হয় ইউনিয়ন পরিষদ। এই অধ্যাদেশকে আংশিক সংশোধন করে ১৯৯২ সালে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) দ্বিতীয় সংশোধনী আইনের [১]আওতায় প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদ বর্ণিত প্রশাসনিক ইউনিটের মর্যাদা দেয়া হয়। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের ভোট সরাসরি নির্বাচিত হন। ইউনিয়ন এলাকায় এতে করে তারা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিই লাভ করেন না বরঞ্চ এর পাশাপাশি গ্রামীন এলাকায় তাদের সম্মান ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সরকার জনগনের সঙ্গে সরকারের যোগসুত্রকারী মাধ্যম হিসাবেও এসব ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে বিবেচনা করে থাকেন। প্রশাসনের সর্বনিম্ন ইউনিট হিসাবে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের মাধ্যমেই সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল জনগনের দোড়গোড়ায় পৌছে দেবার চেষ্টা করা হয়। এ কারনে ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃবৃন্দের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নমূলক কাজে ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহন ও কাজের সমন্বয়ই ''সমতা'' ও ''সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত'' করনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এদিক দিয়ে বিচার করলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এদেশের ৪৪৫১টি ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় নেতৃত্বের কর্মদক্ষতার উপরই উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল [২]। তবে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার পরিষদ তথা ইউনিয়ন পরিষদসমূহ দারিদ্র বিমোচন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় সাধারন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। এই অধ্যায়ে যেসব দিক আলোচনা করা হয়েছে তাতে ইউনিয়ন পরিষদের কয়েকটি সাধারন সমস্যার প্রতি মাঠ জরিপের সময় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা কি হতে পারে অত্র সমীক্ষায় সেটি তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান গবেষনার উদ্দেশ্যগুলো হলো। (ক) বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায়সমূহ নির্ধারন করা। (খ) নির্ধারিত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরন। (গ) ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জনের উপায় নির্ধারন। (ঘ) ইউনিয়ন ভিত্তিক সরকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধাসমূহ নির্নয় ও তার প্রতিকার কৌশল নির্ধারন। (ঙ)ইউনিয়ন পর্যায়ে উৎপাদিত স্থানীয় কৃষি ও কুটির শিল্পের বাজারজাতকরনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরন এবং, (চ)ইউনিয়ন কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধাসমূহ চিহ্নিত করন। মধুখালী থানাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

মাঠ জরিপের ফলাফল বিশ্লেষন করার পুর্বেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদকে সংশ্লিষ্ট করার যে চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে সেদিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। এদিকটা লক্ষ্য করলেই বিশ্বের অপরাপর দেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার তথা ইউনিয়ন পরিষদের পার্থক্য দেখতে পাব। মাঠ পর্যায়ে জরিপ শেষে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদসমূহের নেতৃত্বের যোগ্যতা মোটেও আশানুরুপ নয়। এদের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। সরকারী বেসরকারী যে কোন উন্নয়ন কৌশল নির্ধারনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় আজপর্যন্ত কোন ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিকে রাখা হয় নাই । এমনকি সংসদীয় কমিটির বৈঠকেও স্থানীয় সরকারের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের কোন প্রতিনিধি না রাখায় চেয়ারম্যানদের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠেছে। বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কোন শক্তিশালী জাতীয়ভিত্তিক সংগঠন পরিপুর্নভাবে গড়ে উঠে নাই । সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদের কাঁধে শুধুমাত্র চাপিয়ে দেয়া দায়িত্ব পালন ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকেনা। ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানার অর্ন্তগত ৯টি ইউনিয়ন পরিষদের ১১৫ জন চেয়ারম্যান মেম্বারদের মধ্যে শতকরা ৫৪.৭৮ (৬৩) ভাগ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও মেম্বার স্থানীয় সরকারের নীতি নির্ধারন কার্যাবলীতে ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সংসদীয় কমিটিতে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ের বৈঠকে ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে কাউকে না রাখার ফলে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এদের মধ্যে শতকরা ৩৭.৩৯(৪৩) ভাগ মনে করেন ইউনিয়ন ভিত্তিক উন্নয়নে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের কোন ভূমিকা থাকতে পারে না। সরকারকেই ইউনিয়ন ভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। উন্নয়নের শর্ত হিসাবে এসব চেয়ারম্যান মেম্বার সরকারী ত্রান, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচীর সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থার উপর জোর দেন এবং বাকী শতকরা ৭.৮৩(৯) ভাগ চেয়ারম্যান-মেম্বার এই ব্যাপারে নিরুত্তর থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়নের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যেসব কৌশল গ্রহন করে থাকে সেসব নির্ধারিত কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ইউনিয়ন পরিষদ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এর কারন মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদের এলাকার গন্ডী অত্যন্ত ছোট হয়ে থাকে। এখানে প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের মোটামুটি ব্যক্তিগত পরিচয় থাকে। এক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের তদবীর, পারিবারিক কোন্দল, ধনী-দরিদ্রের শ্রেনীভেদ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত রেষারেষি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।সর্বোপরি সাধারন মানুষের মধ্যে শিক্ষিতের হার কম থাকায় সাধারন মানুষও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকেনা। ইউনিয়ন পরিষদের কাজের ক্ষেত্রে দক্ষতার মূল্যায়ন করা হয় না। ইউনিয়ন এলাকার উচ্চ শিক্ষিত ছেলে মেয়ের ভূমিকাও হতাশাব্যঞ্জক। মাঠ জরিপে দেখা যায় যে, শিক্ষিতদের মধ্যে বেশীরভাগই চাকরী-বাকরীর জন্য ইউনিয়নের বাইরে বসবাস করেন এবং সাধারনতঃ ছুটি কিংবা ঈদের সময় কয়েকজন গ্রামে এসে থাকেন । কিন্তু গ্রামীন উন্নয়নে আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এদের

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহনের কোন সময়, সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ থাকেনা । তবে বর্তমানে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠির মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদে স্থানীয় স্কুল শিক্ষক, পেশাজীবি, শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্য থেকে ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম বৈঠকে নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদের কাজে এদের সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করলে পরিষদের কাজে অগ্রগতি হবে বলে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের শতকরা ৪০ (৪৬) ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন এবং বাকী শতকরা ৬০ ভাগ(৬৯) মনে করেন অনভিজ্ঞ এই সব লোকদের মনোনয়নের মাধ্যমে ইউনিয়নের কাজে অন্তর্ভূক্তকরনে দলাদলী ও রেষারেষি বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়ন কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব সম্পদ কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জনের সবচেয়ে বড় বাধা হলো ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিলের স্বল্পতা । কোন ইউনিয়ন পরিষদই জনগনের কাছ থেকে নিয়মিত ট্যাক্স ও খাজনাদি আদায় করতে পারছেনা। শতকরা ৭৭.৩৯(৮৯) ভাগ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান-মেম্বাররা জানিয়েছেন যে, তারা জনগনের কাছ থেকে নিয়মিত ইউনিয়নের খাজনা আদায় করতে পারছেন না। অন্য দিকে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৮৫.২১(৯৮) ভাগ এবং ৬৮ জন কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৪৪.১২ (৩০) জন নিয়মিত খাজনা দেন। ইউনিয়ন পরিষদের জন্মলগ্ন থেকে আজ অবধি মধুখালীর কোন ইউনিয়ন পরিষদই নিজস্ব তহবিল গড়ে তুলতে পারে নাই। সরকারী অনুদান-সাহায্যর উপরই এরা মূলতঃ নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতির জন্য বহুমুখী কারন দায়ী। মূলতঃ এলাকায় জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান -মেম্বাররা কখনোই ট্যাক্স আদায়ে উৎসাহী হন না। এ ব্যাপারে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে প্রনীত পূর্ব-পাকিস্তান ভূমি কমিশন রিপোর্টটির মতামত বেশ গুরুত্বপূর্ণ [৩]। এতে বলা হয় , ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ তাদের কিছু কিছু অসুবিধার জন্য সরকারী খাজনাদি ঠিকমত আদায় করতে সক্ষম হয় না। খাজনা আদায় ভাল কিংবা মন্দ হলে ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারদের ব্যক্তিগত কোন লাভ বা লোকসান হয় না। এ কারনে তারা সাধারনতঃ খাজনা আদায়ে উৎসাহী হয় না। তাছাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগন স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত সদস্য। দলীয় রাজনীতিও খাজনা ও ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করে। ইউনিয়ন নির্বাচনে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে ও ভোটারদেরকে প্রলুব্ধ করতেও তারা খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে এ রূপ করে থাকেন। অন্য দিকে সরকার যদি ইউনিয়ন বোর্ডের (বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ নামে অভিহিত) এই খাজনা আদায়, হিসাব রক্ষন ও জমির মালিকানা স্বত্ব সংক্রান্ত প্রাথমিক কর্মের জন্য কোন কর্মচারী নিয়োগ করে তার উপর এই সব দ্বায়িত্ব অর্পন করেন তবে উক্ত তদারকী কর্মকর্তা প্রাথমিক পর্যায়ে ইউনিয়ন বোর্ডের এই সব অনিয়ম দূরীকরনে প্রচন্ড প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবেন [৪]। এই রিপোর্টে ইউনিয়ন বোর্ডের মাধ্যমে সরাসরি খাজনা আদায়ের কাজকে নিরুৎসাহিত করা হয় [৫]।পক্ষান্তরে গ্রাম প্রধানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলকভাবে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের ৫টি থানায় খাজনা আদায় প্রথা চালুর প্রস্তাব করা হয় [৬] এবং আদায়কৃত খাজনা থেকে শতকরা ৫ ভাগ কমিশন আদায়কারীকে প্রদান করার

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ করা হয়। খাজনা আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি তহশীল অফিস স্থাপনেরও প্রস্তাব আসে মূলতঃ এই রিপোর্টের মাধ্যমেই [৭]। উপরোক্ত রিপোর্টের আলোকে এ কথা বলা যায় যে, ইউনিয়ন পরিষদ সমূহকে স্বাবলম্বী করতে হলে এবং সরকারের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমাতে হলে উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সুফল ফলার সম্ভবনা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন মেম্বারদের ওয়ার্ড ভিত্তিক কমিটি করে তাদেরকে যদি খাজনা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে আদায়কৃত খাজনার উপর একটি শতকরা লভ্যাংশ দেয়া যায় তবে সে ক্ষেত্রে ইউনিয়ন মেম্বাররা নিজেরাই উৎসাহী হয়ে খাজনা আদায় করবে এবং আদায়কৃত খাজনার হিসাব পত্র সংরক্ষনে সচেষ্ট হবে।মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, মধুখালী থানার ১১৫জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বার ও মহিলা মেম্বার (পরিশিষ্ট-ক (১) দেখুন) এর মধ্যে শতকরা ৪৭.১৫ (৪১) ভাগ মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদের হাতে খাজনা আদায়ের ভার লভ্যাংশের ভিত্তিতে দিলে খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও হয়রানীর সৃষ্টি হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে । ৫০.৬ (৪৪) ভাগ মনে করেন সম্পত্তির সঠিক পরিমাপের উপর ভিত্তিকরে স্থানীয় তহশীল অফিসের মাধ্যমে সরকার সরাসরি ভূমিকর ও ইউনিয়ন পরিষদের খাজনা নিলে দুর্নীতি কম হবে কেননা গ্রামীন মানুষ ইউনিয়ন পরিষদকে নিয়মিত কর প্রদান করার কার্যক্রমকে গুরুত্বহীন মনে করেন, পক্ষান্তরে ভূমির খাজনা প্রদানকে গুরুত্বের সংগে গ্রহন করে ও নিয়মিত স্থানীয় তহশীল অফিসে যেয়ে দাখিলার মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি প্রদান করা আবশ্যক কর্তব্য বলে মনে করেন। উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে বাদবাকী শতকরা ৩৪.৫ (৩০) ভাগ লভ্যাংশের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদের হাতে খাজনা আদায়ের ভার ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দেন। সাধারন কৃষকদের শতকরা ৬০ ভাগ ইউনিয়ন পরিষদের হাতেই খাজনা আদায়ের ভার প্রদানের পক্ষে। তবে খাজনা আদায় কোন পদ্ধতিতে করলে সুবিধা হবে সে বিষয়ে বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করা গেছে। এর থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়েছে যে, খাজনা আদায় পদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত এ বিষয়ে তাদের ধারনা খুব একটা স্পষ্ট নয়। ১৯৫৯ সালের পূর্ব-পাকিস্তান ভূমি কমিশন রিপোর্টের সাথে বর্তমান অবস্থার সামঞ্জস্য না থাকলেও ইউনিয়নের খাজনা আদায় পদ্ধতিকে গতিশীল করতে এর এই সুপারিশকে গ্রহন করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট সবাইকে শিক্ষিত ও সচেতন হতে লাগবে। মধুখালী থানার ইউনিয়ন পরিষদের ১১৫ জন মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের মধ্যে শিক্ষার হার সন্তোষজনক ।এই হার নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ১২.১৭ (১৪) ভাগ, মাধ্যমিক স্তরে শতকরা ৩০.৪৩ (৩৫) ভাগ, উচ্চ মাধ্যমিত শতকরা ৩২.১৭ (৩৭) ভাগ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শতকরা ২৫.২২ (২৯) ভাগ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নয়টি ইউনিয়ন পরিষদের কোন চেয়ারম্যান মেম্বারকে নিরক্ষর পাওয়া যায় নাই। গ্রামের মানুষ এখন শিক্ষিত ও সচেতন নেতৃবৃন্দের প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হচ্ছেন। শিক্ষিত চেয়ারম্যান মেম্বাররা সচেতন। এদের মধ্যে শতকরা ৬৩.৪৮ (৭৩) ভাগ নিয়মিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ পড়েন এবং দেশের জাতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে খোজখবর রাখেন। ২৮.৬৯ (৩৩) ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

অনিয়মিতভাবে এবং মাত্র ৭.৮৩ (৯) ভাগ পত্রিকা পড়েন না। সরকারী আমলাদের অতিরিক্ত খবরদারী ও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবে এদের মধ্যে (১১৫) শতকরা ৬০(৬৯) জনই ক্ষুব্ধ । বাকী শতকরা ১৮.২৬ (২১) ভাগ একে নিয়তি বলে মেনে নিয়েছেন এবং বাকী শতকরা ২১.৭৪ (২৫) ভাগ কোন উত্তর দেননি এই সব ব্যাপারে উত্তর দেয়া এদের অনেকেই নিরাপদ মনে করেন নাই । এতে যে বিষয়টি বের হয়ে এসেছে তা হলো এই ইউনিয়ন পরিষদ স্তরে চাপা ক্ষোভ তুষের আগুনের মত জ্বলছে। এই স্তরের প্রতি যথাযথ যত্নবান না হলে কোন আকস্মিক ঘটনায় যদি এরা একত্রিত হয়ে পড়েন তবে জাতীয় প্রশাসন স্থবির হয়ে যাবে। আগামী শতাব্দীতে মাইনরিটি পাওয়ার বা সংখ্যা লঘিষ্ঠ শক্তির উত্থান ঘটবে এই সত্যর খানিকটা উপলব্ধি করা যায় এক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিশ্লেষন থেকে। সুতরাং আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় না জড়িয়ে এই সব ইউনিয়ন পরিষদকে তাদের কাজের ব্যাপারে ও সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় সীমিত স্বাধীনতা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার যে সত্যই প্রচার করুক না কেন এবং আইনের মাধ্যমে এই ইউনিয়ন পরিষদকে ''স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকার'' হিসাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হোক না কেন মূলতঃ ইউনিয়ন পরিষদ সমূহ তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারের এ সর্ব নিম্ন ইউনিট কাজের ব্যাপারে কোন কালেই পূর্ন স্বাধীনতা ভোগ করে নাই। উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া সিদ্ধান্ত পালন করতে যেয়ে এ সব সংস্থার চরিত্র এমন হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসাবে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রাখতেও আজ এরা অক্ষম হয়ে পরেছে, উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে এদের ব্যর্থতার বোঝা ভারী হয়ে পরছে।

প্রাপ্ত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, শতকরা ৩৭.৩৯ (৪৩) ভাগ চেয়ারম্যান-মেম্বার ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় তাদের কোন ভূমিকা আছে বলে মনে করে না। ব্যতিক্রম বাদে অধিকাংশ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়রম্যান-মেম্বাররা সরকারী অনুদান ভাগাভাগি ও বিভিন্ন তদবির কাজে দুঃখজনকভাবে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন। ইউনিয়ন কেন্দ্রীক বিভিন পরিকল্পনা গ্রহন করা হচ্ছে একথা সত্য, কিন্তু কঠোর বাস্তব হলো এসব সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা শুধুমাত্র সরকারী কাগজের পাতাকেই ভরিয়ে তুলছে। পরিকল্পনার বেশীর ভাগই আমলা নির্ভর বিধায় বাস্তবতার সংগে এর খুব কমই সামঞ্জস্য রয়েছে।

সরকারী অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা। সর্বপ্রধান প্রতিবন্ধকতাই হলো ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে ক্ষমতাসীন যে কোন সরকারই তাদের আজ্ঞাবহ করে রাখতে সচেষ্ট থাকেন। এক্ষেত্রে আমলা নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে একে বশে রাখার কৌশল অবলম্বন কম বেশী সব সরকারই করেছে। এবং তা' অদ্যাবধি অব্যহত রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদকে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার না করে একে রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার দিকেই সরকার সচেষ্ট থাকেন। তবে কোন কোন সরকারের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের কারনে এ ক্ষেত্রে উন্নয়ন সম্ভবপর হয় নাই। অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংভর স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা সফল হলে আমলাতন্ত্রের দুর্নীতির

Dhaka University Institutional Repository

ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে। সর্বোপরি, কর্তৃত্ব হারানোর ভয়েই আমলাতন্ত্র ও স্থানীয় এলিট শ্রেণী কখনোই স্থানীয় সরকারের পূর্ণ বিকাশ চায় নাই।

১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরের বাজেটে স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ৬৫ কোটি ৯১ লাখ টাকা [৮] এবং বরাদ্দের দিক থেকে স্থানীয় সরকার খাত ছিল ৪র্থ স্থানে।এত বিপুল পরিমান অর্থ এ দেশের ৪,৪৫১ টি (১৯৯৫ সালের হিসাব অনুযায়ী) ইউনিয়নের পিছনে পরিকল্পিতভাবে ব্যয় করলে এদেশে আর্থ-সামাজিক চিত্রই হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপজেলা পদ্ধতির সময় (১৯৮৩-৯০) প্রত্যেক উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা পরিষদ কর্মকর্তাগন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কার্যক্রম তদারকীতে এসব ইউনিয়নে যেতে পারতেন। কিন্তু কার্যত খুব কম ক্ষেত্রেই এসব কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা ইউনিয়ন পরিষদের তদারকী কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিতেন।প্রাপ্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বেশীর ভাগ উত্তরদাতাই (শতকরা ৮১ ভাগ) জানাচ্ছেন যে, শুধু মাত্র উপজেলা নির্বাচন কিংবা স্থানীয় সংসদ নির্বাচনের সময়েই সংশ্লিষ্ট দলীয় প্রার্থিরা ইউনিয়ন গুলোতে জনসংযোগ করে থাকেন।ক্ষমতাসীন হবার পর ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম নিয়ে এদের কোন মাথা ব্যাথা থাকে না। বরঞ্চ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা বিভিন্ন তদবিরের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিস, উপজেলা চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সংসদ সদস্যদের দারস্থ হন। এক্ষেত্রে নির্বাচিত সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে নিজ নিজ পছন্দের ইউনিয়ন চেয়ারম্যানকে কিংবা নির্দিষ্ট এলাকায় বিভিন্ন সরকারী ত্রাণ ও সাহায্য বরাদ্দ দিয়ে থাকেন এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে, ইউনিয়ন পরিষদসমূহ শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারী কর্তৃক নিগৃহীত হচ্ছে তাই নয় বরঞ্চ জনপ্রতিনিধিদের দ্বারাও অদৃশ্য নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর থেকে উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাব্য উপায় জানতে চাওয়া হলে উত্তরদাতাদের শতকরা ৮২.৬১(৯৫) ভাগ অংশের অভিমত এই যে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় থেকে এলাকা ও জনসংখ্যার উপর ভিত্তিকরে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের কাছে সরাসরি অর্থ প্রেরনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাপ্ত অর্থে যেন ইউনিয়ন পরিষদ অভ্যন্তরিন যাতায়াতে রাস্তা-ঘাট নির্মান, পুল ব্রীজ নির্মান ও সংস্কার সাধন করতে পারে সেজন্য ইউনিয়ন পরিষদের হাতে টেন্ডার গ্রহন ও কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষমতা দিতে হবে। শতকরা ১২.১৭(১৪)ভাগ উত্তরদাতা বর্তমান পদ্ধতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এই মর্মে যে, থানা কিংবা উপজেলার সাথে ইউনিয়নের সংযোগ সাধনের জন্য থানা পরিষদের সহায়তায় ইউনিয়ন পরিষদ কাজ করবে। শতকরা ৫.২২ (৬) ভাগ উত্তরদাতা উত্তরদানে বিরত থাকেন। তবে এক্ষেত্রে দোষী ব্যক্তিদের বিচারে ইউনিয়ন ট্রাইব্যুনাল গঠনের পক্ষেও শতকরা ৮২.৬১ (৯৫) ভাগ উত্তরদাতা রায় প্রদান করেন।

এছাড়া ইউনিয়নভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প চালুর ব্যাপারে শতকরা ৬০(৬৯) ভাগ অভিমত প্রকাশ করেন। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভিত্তিক হেলথ কার্ড প্রচলনের পক্ষে এরা অভিমত দেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ইউনিয়ন মনিটরিং সেল গঠন করতে পারে এবং ইউনিয়ন সমূহের কাজের অগ্রগতি বিবেচনা করে সরকারী বরাদ্দ বাড়ানো- কমানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব ও কার্যক্রম সংক্রান্ত জাতীয় কমিটিও গঠন করা যেতে পারে বলে শতকরা ৭৯.১৩(৯১) ভাগ উত্তরদাতা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এতে করে সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ইউনিয়নসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।তবে শতকরা ১৩.৯১(১৬) ভাগ উত্তরদাতা সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন এতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে কোন কাজ হবেনা। বাকী মাত্র শতকরা ৬.৯৬(৮)ভাগ উত্তরদাতা উত্তর দানে বিরত ছিলেন।

অত্র সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে উৎপাদিত কৃষিপন্য বাজারজাত করনের ক্ষেত্রে সঠিক ধারনা ও সুযোগের স্বল্পতার জন্য কৃষকেরা পরবর্তীতে কৃষিকাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। এটি ইউনিয়ন পর্যায়ে উৎপাদিত ক্ষুদ্র শিল্প ও হস্তজাত শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কৃষিপন্যের বাজার অনুসন্ধান ও সঠিক মুল্য নিশ্চিতকরনের জন্য ইউনিয়ন থেকে থানা পর্যায় পর্যন্ত একটি নেটওয়ার্কের বড় অভাব রয়েছে। বর্তমানে (১৯৯৯)বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রনালয় ও বিশ্বসার সংস্থার মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী গঠিত প্রকল্প এ.টি.ডি.পি. এই বাজার অনুসন্ধান ও পন্যের বাজারজাতকরন প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে বিভিন্ন কর্মসুচি প্রনয়ন করছে। এসব কর্মসুচি থানা ভিত্তিক বৃহৎ ও মাঝারি কৃষক ও কৃষিপন্য প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে থানা কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা কর্মচারীরাও এক্ষেত্রে পরিস্কার ধারনা রাখেননা। ক্ষুদ্র কৃষক পর্যায়েও এরুপ কর্মসুচি গ্রহন করে সেটি ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে গেলে সন্তোষজনক ফলাফল লাভ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে এ কর্মসুচিকে আরো ব্যাপক জন পরিচিত করার জন্য জাতীয় গনমাধ্যমগুলোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। সরকারী এই গৃহীত কার্যক্রমের প্রতি বৃহৎ ও মাঝারী পর্যায়ের কৃষক ও কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিতদের বিপুল আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে।

মধুখালী থানার বিভিন্ন ইউনিয়নে বিভিন্ন এন,জি,ও, গ্রামীন আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। যে সব এন,জি,ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত তাদের সমন্বয়ে একটি কার্যকর কাউন্সিল গঠন করলে এক্ষেত্রে বেশ সুফল পাওয়া যাবে। কৃষিজাত পন্য বাজারজাতকরন ও বিপননে এন,জি,ও দের সঙ্গে সরকারী কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন করলে ফলাফল সন্তোষজনক হবে বলে আশা করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে মধুখালী থানায় কার্যরত বিভিন্ন এন.জি.ওদের মাঝে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা গেছে প্রকটভাবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার ও এন.জি.ওদের কাজের সমন্বয় সাধন করতে হবে ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করেই। প্রযুক্তি ও তথ্যর গতি প্রবাহকে সচল রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে সম্বন্বিত নেটওর্য়াক ব্যবস্থার পক্ষে মত দিয়েছেন শতকরা ৪৭.৮৩ (৫৫) ভাগ উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

বহুস্তরের মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধন করে কৃষক যাতে সরাসরি বিক্রয় কেন্দ্রে এসে পন্য বিক্রয় করতে পারে সে লক্ষ্যে ইউনিয়ন ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ক্রয়কেন্দ্র খোলার পক্ষে মত দিয়েছেন শতকরা ৮৪.৩৫(৯৭)ভাগ উত্তরদাতা। পটনশীল কৃষিপন্য দ্রুত বিক্রয় ও বাজারজাতকরনের লক্ষ্যে স্যাটেলাইট ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র ইউনিয়নের উদ্যোগে চালুকরা যেতে পারে।এর ব্যবস্থাপনাগত দায়-দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদের হাতে দেয়া যেতে পারে। এসব কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত টোল ও খাজনা ইউনিয়ন পরিষদের তহবীলকে শক্তিশালী করতে আবদান রাখবে।

ইউনিয়ন কেন্দ্রীক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পিছনে যেসব বাধা প্রধান তার মধ্যে রয়েছে সুষ্ঠু যোগাযোগ নেটওয়াকের অভাব , গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ সুবিধাসহ অবকাঠামোগত সমস্যা, ইউনিয়ন ও থানার মধ্যে কাজের সমন্বয়ের অভাব, এক ইউনিয়ন থেকে অন্য ইউনিয়নের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, ইউনিয়ন পরিষদকে রাজনৈতিক ও প্রভাবপ্রতিপত্তির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের প্রবনতা, স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সংকীণ মনোভাব, সংকীর্ণ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক স্বার্থ, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেনী গোষ্ঠির পারস্পরিক কোন্দল ও হিংসা বিদ্বেষ, টার্গট শ্রেনীর অধিপত্য, সত্যিকার সুশিক্ষার অভাব, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে প্রচন্ড রকম অসমতা, সরকারী কর্মকর্তাদের মনোভাব, ভূমি ব্যবস্থার দুর্নীতি ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে উত্তরনের পথ একটাই সেটি হলো গনসচেতনতা বৃদ্ধিকরন, শিক্ষার বিস্তার ও প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত একটি পাঠাগার ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করে তথ্যর অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরনের ব্যবস্থা করা। সঠিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে গনসচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় এবং মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করা যায়। দারিদ্রতার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে যে গনসচেতনতা প্রয়োজন তার জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিশাল অবদান রাখতে পারে। যে কাজ জনগনকে আলোচনার মাধ্যমে বুঝানো সম্ভব নয়, সেগুলি গানের মাধ্যমে, কবিতার মাধ্যমে করা সম্ভব। স্থানীয় সাংস্কৃতিক কর্মী, পল্লীকবি, কবিয়াল, বাউল এদের গনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সম্পৃক্ত করতে হবে। শিক্ষাবিস্তারে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে, বিভিন্ন সামাজিক অনাচার তুলে ধরতে সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের অবদান ব্যাপক।

মধুখালী থানায় পরিচালিত সমীক্ষায় স্থানীয় পর্যায়ের কৃষি-শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রদত্ত ঋনদান ব্যবস্থায় দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সমীক্ষার প্রশ্নোত্তর পর্বে কৃষক উত্তরদাতাদের শতকরা ৫০.৪৩(৫৮) ভাগ ব্যাংকের একশ্রেনীর কর্মকর্তা-কর্মচারী উৎকোচের বিনিময়ে জমির অধিক মূল্য দেখিয়ে কিংবা ভূয়া ও জাল দলিল দস্তাবেজ ও কাগজপত্রের মাধ্যমে অসাধু ব্যক্তিদের ব্যাংক ঋন নিতে উৎসাহ প্রদান করে বলে জানান। অন্যদিকে প্রকৃত কৃষক যার সত্যিকার অর্থে ঋন লাগবে তার ক্ষেত্রে রয়েছে হাজারো রকমের জটিলতা। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যারা যোগসাজসের মাধ্যমে ব্যাংক ঋন গ্রহন করে থাকেন তারা তাদের গৃহীত ঋনের টাকা যথাসময়ে ব্যাংককে ফেরত দেননা। সাক্ষাৎকারপর্বে অনেক কৃষক জানতে চেয়েছেন সরকার ৫০০০/= টাকা পর্যন্ত কৃষিঋন মওকুফের কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কিনা। এদের মধ্যে অনেকে অন্য কোন বৃত্তি বা ব্যবসায় নিয়োজিত। এরাও কৃষিঋন গ্রহন করেছেন। অন্যদিকে ঋনের টাকা পরিশোধ করার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাপারে এদের উদাসিনতা দেখা গেছে। প্রদত্ত ঋন আদায়ের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর সাফল্য মোটেই আশানুরুপ নয়। বাংলাদেশে এক্ষেত্রে গ্রামীন ব্যাংকের সাফল্য বেশ ব্যতিক্রম। গ্রামীন ব্যাংকের সদস্য সংখ্যা ২১ লক্ষ (১৯৯৬)। ১৯৯৬ সালে ১০৫০ টি শাখার মাধ্যমে ৩৫৩৫৭টি গ্রামে গ্রামীন ব্যাংক তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে এবং গ্রামীন ব্যাংকের প্রদত্ত ঋন ফেরত পাবার রেকর্ড অবিশ্বাস্য! শতকরা ৯৪ ভাগ। এর মূলকারন গ্রামীন ব্যাংক শুধুমাত্র ঋন প্রদান করেই বসে থাকেনা।এরা এদের প্রদত্ত ঋন সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটিও মনিটরিং করে থাকে। গ্রামীন ব্যাংকের কর্মচারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে।ব্যাংকিং খাতে জবাবদিহিতার ব্যাবস্থা চালু করলে সরকারী-বেসরকারী ব্যাংকিং সেক্টরেও উন্নতি সম্ভব বলে মধুখালী থানায় অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় শাখার ব্যবস্থাপকগন মনে করেন।

জমির মালিকানা গ্রামের প্রভাব প্রতিপত্তির একটি বড় হাতিয়ার হিসাবে স্বীকৃত এবং জমি থেকে প্রাপ্ত আয়কেই আজ পর্যন্ত সবচেয়ে নিরাপদ ও স্থিতিশীল আয় হিসাবে ধরা হয় [৯]।

এই ভুমি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দূনীর্তি এখন ব্যপক আকার ধারন করেছে। মাঠ পর্যায়ে বর্তমান গবেষনা কাজ চালানোর সময় (এপ্রিল-মে-৯৯)মধুখালী থানার বনমালদিয়া মৌজায় ভুমি জরিপের কাজ চলছিল। সরকারী বরাদ্ধ প্রাপ্ত ভূমি অন্য নামে রের্কডকরন, ইত্যাদি অব্যবস্থা লক্ষ্য করা গেছে। এর কারন হিসাবে জানা যায়, ভূমি জরিপের কাজে নিয়োজিত সর্দার আমিন, বদর আমিন দের চাকরী অস্থায়ী (শুধুমাত্র জরিপের সময় কাল) ফলে এরা স্বার্থহীন চিত্তে উৎকোচ গ্রহন করে ও দুনীতির আশ্রয় নেয়। তাদের দুর্নিতির ফলে সাধারন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এব্যবস্থা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের হাতে বা তত্বাবধানে করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে । পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ভুমিজরিপের কাজে নিয়োজিত আমীনদের চাকুরী অস্থায়ী। এদের হাতে ভুমিজরিপের তিনটি গুরুত্বপুর্ন ধাপ, যথাক্রমে কিস্তোয়ার, খানাপুরী ও বুঝারতের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে মাঠ পর্যায়ে গুরুত্বপুর্ন এই তিনটি কাজের দায়িত্ব অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত আমিনদের হাতে থাকাতে এখানে দুর্নিতির চিত্র অত্যন্ত প্রকট। এক্ষেত্রে ১৯৫৯ সালের পুর্ব পাকিস্তান ভুমি রাজস্ব কমিশনের সুপারিশ মালাসমুহ [১০] গ্রহন করা যেতে পারে। ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে সঠিক পন্থায় প্রকল্প আরম্ভের পূর্বে হিসাব না করাতে সমস্যার সৃস্টি হয়ে থাকে। কোনকোন ক্ষেত্রে থানা পরিষদ এমন কিছু প্রকল্প অনুমোদন করেন যা'কিনা বেশ ব্যয়সাপেক্ষ। আবার এমন কিছু প্রকল্প অনুমোদন করে থাকেন যাতেকিনা স্বল্প বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। অথচ এসব কাজ অনেক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদই সরাসরি করতে পারতো। আবার অনেক ক্ষেত্রে কাজের সময় দেখাযায় যে, মূল বা সঠিক খরচের চেয়ে বর্তমান কাজের খরচ অনেক নীচে ধরা হয়েছে [১১] অথচ গ্রামীন কর্ম ম্যানুয়েল প্রতিটি প্রকল্পের পরিকল্পনা, নমুনায়ন, বিস্তার, পরিধি, উচ্চতা গভীরতা এবং খরচ সম্পর্কে নির্দেশ করে [১২]। এ পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে গৃহীত বিভিন কাজের বর্ননায় যে চিত্র ফুটে উঠেছে তা সত্যিই অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। মোট ১১৫ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-মেম্বারদের মধ্যেশতকরা ৮১.৭৪(৯৮) ভাগ ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারী দুনীতির ভয়াবহ চিত্র তুলে

Dhaka University Institutional Repository

ধরেছেন। এরা স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল বিভাগের অভ্যন্তরীন দুর্নীতিসহ থানা ও জেলা পর্যায়ের আমলাদের দুর্নীতির চিত্র তুলে ধরেন। বর্ণনা মতে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীন রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন করা হয়ে থাকে। কোন প্রকল্প গ্রহনের প্রাককালে যে পরিমান গম বরাদ্দ করা হয় তার শতকরা ৩৫ থেকে সর্ব্বোচ্চ ৪৫ ভাগ পর্যন্ত উৎকোচ প্রদানের জন্যই ব্যয় হয়ে যায়। তদবিরের মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় সংসদ সদস্যর অনুমোদন লাভের পরেও বর্তমান বাজারদর (১৯৯৯) অনুযায়ী প্রতি টন গমে ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা পর্যন্ত উৎকোচ দিতে হয়। এ টাকা চেয়ারম্যানরা নিজেরাই দেন এবং প্রকল্প পাশের পর ডি.ও হাতে পাবার সময় সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে কার্যাদেশ গ্রহন করেন। ফলে স্বভাবতইঃ ইউনিয়ন চেয়ারম্যানরা তাদের লগ্নিকৃত টাকা লাভসহ উঠাতে চান এবং তাদের কাছে উন্নয়নের উদ্দেশ্য গৌন হয়ে যায়। এ কারনেই উন্নয়ন ব্যাহত হয়।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বার ভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য হলে সেক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য এদের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গড়িমসি করেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য থানাওয়ারী সরকারী অনুদান ও সাহায্য তার পছন্দ মত ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মেম্বারদের নামে বরাদ্দ করেন। ইউনিয়ন গৃহীত অনেক ভাল ও অর্থনৈতিক লাভজনক প্রকল্প স্থগিত করে অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় সংসদ সদস্য মনোনিত প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। সরকারী গম, টিন, দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রেরিত অর্থ ও পন্য সাহায্য দুর্গত অঞ্চলে বন্টনের ক্ষেত্রেও দলীয় মনোবৃত্তি কাজ করে থাকে।

বর্তমানে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকার প্রতিটি গ্রাম থেকে একজনকে মাসিক ১০০ টাকা বয়স্ক ভাতা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমান জরীপে দেখা গেছে সরকারী এই ভাতা শতকরা ৮৫ ভাগই নিজ দলীয় বয়স্ক কর্মীদের দেয়া হয়েছে। আবার বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পূর্বে স্থানীয়ভাবে সরকারী খাস ভূমি বন্দোবস্তের সময় তৎকালীন সরকার সমর্থক কর্মীরা খাস ভূমির বরাদ্দপত্র পাবার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। দলীয় রাজনীতির প্রভাব স্থানীয় পর্যায়ে বেশী । তবে সাধারনতঃ পারস্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এসব ক্ষেত্রে ভাগ বন্টনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্থানীয় নেতৃত্বের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও সততার মনোভাব সৃষ্টি হলে এবং এসব বন্টন ব্যবস্থা স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে দিলে জনগন এর সুফল ভোগ করবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকাঃ

১. দেখুন, The Local Government (union parishad) Act-1992 (Act no 45 of1992) Bangladesh Gezette (Ext.), 10 November, 1992.

২. Government of Bangladesh, Statistical Pocket Book of Bangladesh 1997 (Dhaka: Ministey of Planning, Bangladesh Bureau of Statistics, January 1998) পৃষ্ঠা-৩

৩. দেখুন, Report of the Land Revenue Commission, East pakistan Govt.Press,Dhaka: July, 1959, পৃষ্ঠা-৩১

৪. দেখুন, Report of the Land Revenue Commission, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩১

৫. দেখুন, Report of the Land Revenue Commission, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭

৬. দেখুন, Report of the Land Revenue Commission, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭

৭. দেখুন, Report of the Land Revenue Commission, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৯

৮. দেখুন, ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের বাজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন, ১৯৯৬।

৯. দেখুন, A,H. M. Aminur Rahman , politics of Rural Local self Government in Bangladesh (Dhaka: University of Dhaka, 1990), পৃষ্ঠা-৭৭

১০.দেখুন, Report of the Land Revenue Commission, East pakistan, July, 1959.

১১.দেখুন, Nazmul Abedin, Local Administration and polities in modernising Societies: Bangladesh and pakistan. (Dhaka: National Institute of pablic Administration, Dhaka, 1973) পৃষ্ঠা-২৯৭. আরো দেখুন Second Evaluation Report (East Bengal)

১২.দেখুন, Manual for Rural public Works. পৃষ্ঠা-৭., দেখুন, The Local Councils (Devclopment Plans) Rules, 1960, Government of Pakistan, Dhaka, 30-6-68.

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায়-৫

গবেষনায় প্রাপ্ত ফলাফলের সংক্ষিপ্তসার ও সুপারিশমালা

বর্তমানকালে শাসনপদ্ধতি ক্রমাগত জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাপ ও নানাবিধ সমস্যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একার পক্ষে আজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে সমৃদ্ধির লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ গ্রহন করা হয় তার বাস্তবায়ন সুদূর শাসনকেন্দ্র থেকে জটিল ও কঠিন হয়ে পড়ায় এবং উক্ত বাস্তবায়ন কাজে স্থানীয় জনগনের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা [১] আধুনা রাষ্ট্রের সার্বিক ক্ষমতার গনতন্ত্রায়ন ও বিকেন্দ্রীকরনের ধারনাও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাজ করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সরকারে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালনের পিছনে পাশাপাশি এপদ্ধতির দ্রুত বিকাশে নিম্নোক্ত কারনগুলো প্রধান।

১. আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী বর্তমানে বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দুর থেকে সব কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে উঠে না। ফলে স্থানীয় সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ।

২. স্থানীয় সরকার দ্রুত, স্বল্পব্যয়ে ও স্থানীয়ভাবে জনগনের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩. স্থানীয় সরকার একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় যেমন ইউনিয়ন, উপজেলা/থানা, জেলা, পৌর এলাকা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে। ফলে জনগনের মধ্যে রাজনৈতিক ও নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

৪. গণতন্ত্র শিক্ষা ও চর্চার প্রথম পাদপীঠ স্থানীয় সরকার।

৫. কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যক্রমে জনগন প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহনের সুযোগ না পেলেও স্থানীয় সংস্থাগুলোয় কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহনের সুযোগ আছে। ফলে এতে জনগনের কর্মদক্ষতা সঠিকভাবে প্রয়োগ সম্ভব হয়।

৬. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রনীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার উন্নয়নের সহায়ক হিসাবে কাজ করে।

৭. কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা প্রনয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য ও জরীপকাজে স্থানীয় সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৮. স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নে গৃহীত ক্ষুদ্র প্রকল্প ও এলাকার উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন স্থানীয় সরকারের মাধ্যমেই সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

৯. স্থানীয় পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগনকে সরকার উন্নয়নমূলক কাজে সরাসরি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন।

১০. স্থানীয় সরকার স্থানীয় জনগনের অভাব অভিযোগ দুর করতে পারে। স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিলে সকলের সাহায্যে তা বাস্তবায়ন করা সহজ হয় এতে স্থানীয় ক্ষেত্রে স্ব-নির্ভরতার বিকাশ লাভ সম্ভব হয়।

১১. স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান মেম্বাররা জনগনের প্রতিনিধি বলে তাদেরকে স্থানীয় জনগনের কাছে সবাসরি দায়ী থাকতে হয়।এতে করে উন্নয়নমূলক কাজে তারা সচেষ্ট থাকেন [২] ।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ (যদিও সর্বনিম্ন স্তর হিসাবে পল্লী পরিষদের প্রস্তাব করা হয়েছিল)।সাধারনতঃ প্রায় ১৫-২০ হাজার লোক অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে স্থাপিত হয় একটি ইউনিয়ন। এসব ইউনিয়নে স্থানীয়ভাবে সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি ''ইউনিয়ন পরিষদ''গঠন করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ নামে চালু এই স্থানীয় সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বির্বতনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আমরা এদেশের স্থানীয় সরকারের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করলে এর কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবলী প্রত্যক্ষ করি [৩]।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোন থেকে স্থানীয় সরকারের এই ক্রমবিকাশের স্তরকে চারটি আমলে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ (১) প্রাক ইংরেজ আমল (২) ইংরেজ আমল (৩) পাকিস্তান আমল এবং (৪) বাংলাদেশ আমল।

ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের বহু পূর্ব হতে এদেশের স্থানীয় পর্যায়ের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত গ্রামের গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত '' পঞ্চায়েতের'' মাধ্যমে। ''গ্রাম পঞ্চায়েত'' শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বিচার-আচার ইত্যাদির দ্বায়িত্ব পালন করতেন। এই ব্যবস্থা ছিল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিরই একটি ঐতিহ্যবাহী অংশ। যুগ যুগ ধরে ধীরে ধীরে আপন আবয়বে ও বৈশিষ্ট্যে এটি গড়ে উঠেছিলো। বৃটিশ শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়েও এ অঞ্চলে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অপ্রতিহত ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল।

ইংরেজ আগমনের পর এই ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন গ্রামীন শাসন ব্যবস্থা আস্তে আস্তে নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৭৯৩ সালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারনে (লর্ড কনওয়ালীসের সময়) এদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশ হয় এবং এর মাধ্যমে জমিদার শ্রেনীর সৃষ্টি হয় । নব্যজমিদাররা রাজস্ব আদায় ও স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দ্বায়িত্ব লাভ করেন কিন্তু তাদের অত্যাচারের অতিমাত্রার ফলে শান্তি-শৃঙ্খলার পরিবর্তে বহু জায়গায় দেখা দেয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা।

মূলতঃ এই বিশৃঙ্খলা রোধকল্পে ১৮৭০ সালে (লর্ড মেয়োর আমলে) গ্রাম চৌকিদারী আইন পাশ হয়। এ আইনে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট পঞ্চায়েত নিযুক্ত করা হয় । পঞ্চায়েতের সব সদস্যই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (জেলা প্রশাসক) কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। নিয়োগকৃত কোন পঞ্চায়েত

Dhaka University Institutional Repository

সদস্য পদ গ্রহনে অস্বীকৃতি জানালে তাকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হতো। পঞ্চায়েতরা জনগনের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করতেন। এ সময়ে সর্ব নিম্ন ট্যাক্স বা করের হার ছিল ছয় আনা। যদি পঞ্চায়েত কোন কারনে চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করতে অক্ষম হতেন তবে সেক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করে চৌকিদারদের বেতন পরিশোধ করার বিধান ছিল। পঞ্চায়েতের সদস্যগন সাধারনত তিন বছরের জন্য নিযুক্ত হতেন। এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় যে সব অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়েছিল সেগুলো হলঃ

ক) পঞ্চায়েতের সদস্যরা ছিলেন মনোনীত। তারা জনগন কর্তৃক নির্বাচিত হতেননা বিধায় জনগনের কাছে দায়বদ্ধ ছিলেননা।

খ) পঞ্চায়েত সদস্যরা ট্যাক্স আদায়, তহবিল সৃষ্টি, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক সময় অযোগ্য বলে বিবেচিত হতেন।

গ) চৌকিদারেরা অনেক সময় নিয়মিত বেতন পেতেন না।

ঘ) সমাজকল্যানমূলক কোন কাজের দায়িত্ব পঞ্চায়েতের ছিলনা।

ঙ) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় কোন রকম দায়-দায়িত্ব এদের উপর ছিলনা।

স্থানীয় পর্যায়ে অধিক দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ইতিপুর্বেই গৃহীত। র্লড রিপনের রেজুলেশনকে সংশোধিতরুপে ১৮৮৫ সালে বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে (বঙ্গীয় আইন পরিষদ) বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন হিসাবে পাশ করা হয়। এই আইনে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড গঠন করা হয়। সাধারনত ১০ থেকে ১৫ বর্গমাইল এলাকার মধ্যে পাঁচ হতে নয় জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে দুই বছরের জন্য একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হত। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বমুলক নীতি এভাবে সর্বপ্রথম গৃহীত হয়। ইউনিয়ন কমিটির উপর রাস্তা-ঘাট র্নিমান, সেতু নির্মান, প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষনাবেক্ষন, চিকিৎসা জন্ম-মৃত্যু রেজীষ্ট্রিকরন, পয়ঃপ্রনালী নিষ্কাষন প্রভৃতি উন্নয়নমুখী দায়িত্ব অর্পিত ছিল। সাধারনতঃ জেলাবোর্ডের থেকে পাওয়া অনুদানের সাহায্য এই সমস্ত উন্নয়ন কাজের ব্যায়ভার বহন করা হতো। এই ইউনিয়ন কমিটির কর আরোপের ক্ষমতা ছিলনা। আর্থিক দুর্বলতার কারনে কমিটি ভালভাবে কাজ করতে পারতো না। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এসময়ে একই সাথে ইউনিয়ন কমিটির পাশাপাশি পুর্বে গঠিত চৌকিদারী পঞ্চায়েতও কাজ করে যাচ্ছিল।

১৯১৯ সালে পাশকৃত পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইনে চৌকিদারী পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি বিলুপ্ত করে ''ইউনিয়ন বোর্ড'' নামে একটি মাত্র স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান রাখা হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্যকাল প্রথমে তিন বছর পরে ১৯৩৬ সালে চার বছর করা হয়। এই আইনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

ক) ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ছিল ছয় হতে নয় জন। এর দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন এবং এদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যকে সরকার মনোনয়ন দান করতেন। সদস্যদের মাধ্যমেই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন।

খ) ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ তদারক করার জন্য এসময়ে সার্কেল অফিসার (সি,ও) পদ সৃষ্টি করা হয়।

গ) ইউনিয়ন বোর্ডের বিচার কাজ পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন বেঞ্চ ও কোর্টের বিধান ছিল।

ঘ) ২১ বছর বয়স্ক ব্যক্তির ভোটের মাধ্যমে ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যরা নির্বাচিত হতেন। ভোটারগন প্রিজাইডিং অফিসারের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য প্রার্থীর নাম বলে ভোটদান কাজ সমাধা করতেন।

ঙ) এই সময়ে ইউনিয়ন বোর্ডকে কর আরোপ ক্ষমতা দেয়া হয়।

বৃটিশ শাসনামলে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সম্পূর্ন আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রনে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। এই ব্যবস্থার জনক হিসাবে পরিচিত লর্ড রিপন এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাজনৈতিক কারনের উপরই বেশী জোরদিয়েছিলেন। কোন প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইংরেজ সরকার তাদের এই নয়া কার্যক্রম শুরু করেনাই [৪]। ইংরেজ প্রবর্তিত এই ব্যবস্থায় গনতন্ত্রের লেশমাত্র ছিলনা। মুলতঃ সরকারী কর্মকর্তাদের ইচ্ছার পুতুল হিসাবেই তৎকালীন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা কাজ করতো। এখানে একথাটাও সত্য যে,তৎকালে সাধারন মানুষ তাদের গনতান্ত্রিক অধিকার সর্ম্পকে অসচেতন ছিলেন।

পাকিস্তান আমলে মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁন মৌলিক গনতন্ত্র আদেশ জারী করেন। এই আদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল, জেলা পর্যায়ে জেলা কাউন্সিল এবংবিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কাউন্সিল গঠন করা হয়। এই সময়ে ইউনিয়ন কাউন্সিলের যেসব বৈশিষ্ট্য ছিল তা হলোঃ

ক) প্রতিটি ইউনিয়ন গড়ে দশহাজার লোক নিয়ে গঠিত হতো এবং প্রতি একহাজার লোকের জন্য একজন সদস্য নির্বাচিত হবেন বলে স্থির করা হয়। প্রত্যেক ইউনিয়নে নির্বাচিত সদস্য ছাড়াও মনোনীত সদস্য থাকতেন। কিন্ত তাদের সংখ্যা নির্বাচিত সদস্যের অর্ধেকের বেশী হতে পারতনা।

খ) নির্বাচিত ও মনোনিত সদস্যদের ভোটে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন।

গ) ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা করা হয়।

এই ব্যবস্থায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন ও মনোনয়ন প্রথা পাশাপাশি ত্রুটিপূর্ন ছিল।বিশেষতঃ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন বলে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া সহজ ছিল। বিতর্কিত এই মনোনয়ন প্রথা পরবর্তীকালে বিলুপ্ত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭ অনুযায়ী পুবর্তন মৌলিক গণতন্ত্রের সব কয়টি সংস্থাকে ভেঙ্গে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। এতে ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রশাসক ইউনিয়নের কৃষি অফিসার বা তহসীলদার ছিলেন। এ সময় ইউনিয়ন কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ''ইউনিয়ন পঞ্চায়েত'' রাখা হয়। ১৯৭৩ সালের ২২শে মার্চ রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২২ জারী করেন এবং এ আদেশে ''ইউনিয়ন পঞ্চায়েত'' নাম পরিবর্তন করে এর নাম দেয়া হয় ''ইউনিয়ন পরিষদ''। এতে প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন করে মোট নয়জন নির্বাচিত সদস্য এবং সমস্ত ইউনিয়নের থেকে প্রত্যক্ষ ভোটে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার বিধান করা হয়।

১৯৭৬ সালের ২২শে নভেম্বর স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ [৫] জারী করা হয়। অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে ''ইউনিয়ন পরিষদ,''থানাপর্যায়ে ''থানা পরিষদ'' এবং জেলা পর্যায়ে ''জেলা পরিষদ'' এই তিনস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

১৯৮৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ইউনিয়ন পরিষদের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ জারী করা হয় [৬]।

সরকার এইসব আইনের মাধ্যমে গ্রামীন মানুষের ভাগ্যর উন্নতির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের হাতে অনেক উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্বভার তুলে দেন। কিন্তু সরকারের কোন পদক্ষেপই পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে নাই। আমলা ও স্বার্থান্বেষী মহলের বিভিন্নমূখী বাধার কারনে ইউনিয়ন পরিষদগুলো আজ পর্যন্ত (১৯৯৯) স্বাধীনভাবে কোন কাজ করতে পারে নাই। এসব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সরকারকে কখনোই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ ও ক্ষমতা দেয়া হয় নাই। রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে এসব স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষমতাসীনদের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে যুগে যুগে।

বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের দুর্বলতার অন্যতম কারন খুজতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, উপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক গঠন প্রক্রিয়ায় প্রভাবান্বিত হয়ে প্রথম দিক থেকেই এ সব প্রতিষ্ঠানকে জনবিচ্ছিন্ন চরিত্রে গঠন করা হয়েছিল। সাধারন মানুষের পক্ষে এ সব প্রতিষ্ঠানের কাজে অংশ গ্রহন ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। উপনিবেশিক আমলের মনমানসিকতা সম্পন্ন আমলাতন্ত্রের সদস্যরা উন্নয়ন কাজে ও দেশ গড়ার কাজে বাস্তব কোন প্রশিক্ষন লাভ করে নাই। জনগনের সাথে আমলাদের এই ব্যবধান কোন ক্রমেই উন্নয়নে সহায়ক নয়। দেশের প্রকৃত উন্নয়ন করতে হলে এবং অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌছানের জন্য জনগনের সংগে আমলাতন্ত্রের সদস্যদের সম্পর্ক হতে লাগবে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগীতা মূলক। আমলাতন্ত্রের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে লাগবে। এতে করে জনগনের মধ্যে আমলাদের গ্রহনযোগ্যতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান আধুনিক বিশ্ব প্রেক্ষাপটে এই ব্যবস্থা চালু করা ছাড়া কোন বিকল্প নাই। সরকারী কর্মকান্ড আরো গতিশীল করার জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের

Dhaka University Institutional Repository

মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন করতে হবে। শুধুমাত্র অফিসে বসে থেকে কাজের মনমানসিকতা বদল করতে হবে। গ্রামীন মানুষের সংগে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে হবে। স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের অন্যায় কাজে নিরপেক্ষভাবে বাধা দিতে লাগবে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে লাগবে।

গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশে গ্রামীন অবকাঠামোগত উন্নয়নের দিকে জোর দিতে লাগবে। অনেক ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব অফিস ভবন পর্যন্ত নাই, যে গুলো রয়েছে সে গুলোর অবস্থাও অত্যন্ত জীর্ন। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন কমপ্লেক্স গড়ে তুললে সাধারন মানুষজন এই ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমের প্রতি আকৃষ্ট হবেন। ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে উন্নয়ন ঘটাতে হলে আগে এর বাহ্যিক উন্নয়ন করতে হবে। কেননা এর সংগে মানুষের মনস্তাত্বিক ব্যাপারও জড়িত। সুন্দর পরিবেশ, অবকাঠামো মানুষকে স্বভাবতইঃ আকৃষ্ট করে এবং তার কার্যক্রমের উপর আস্থাশীল করে তুলে ।

গ্রামীন অর্থনীতির বিকাশে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম । সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠলে মানুষের মধ্যে প্রান চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। এতে কৃষকেরা তাদের পন্য সহজে স্থানীয় বাজারে নিতে পারেন। পন্যর নায্যমূল্য পান এবং কৃষিজাত পন্যর গুনগত মানও অক্ষুন্ন থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ইউনিয়নের সাথে থানা সদরের সংযোগ সড়ক স্থাপনের পদক্ষেপ নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং থানা সদর থেকে জেলা সদর পর্যন্ত সুষ্ঠু যোগযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।প্রতিটি গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বিদ্যুৎ পৌছে দেবার ব্যবস্থা করলে স্থানীয় ভিত্তিতে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নকে সকলেই আজ গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিছুদিন আগের বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উন্নয়নের প্রয়োজনীয় মূলধনের শতকরা ৬৪ ভাগই আসছে মানবিক ও সামাজিক মূলধন থেকে এবং এটাও দেখা গেছে যে, ধনী দেশগুলোর মাথাপিছু আয়ের ৫০ ভাগই জ্ঞান নির্ভর। এক্ষেত্রে যে বার্তা পাওয়া যায় তা স্পষ্ট। অর্থাৎ বাংলাদেশের মত অনুন্নত দেশগুলোকে মানব উন্নয়নে বিশেষ করে শিক্ষাখাতে লগ্নী করতে হবে প্রচুর যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নতি করা যায়। এই ব্যবস্থাই হবে উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি [৭]।

তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পউন্নত দেশগুলো এখন তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কৃষি উন্নয়নের দিকে ঝুকে পড়েছে। কেননা শিল্প স্থাপনে যে সময় প্রয়োজন তাতে শিল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে তারা টিকে থাকতে পারবে না, সুতরাং স্বল্পতম সময়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি উন্নয়নের কোন বিকল্প নাই। গ্রামীন উন্নয়নের পূর্ব শর্তই হল কৃষি উন্নয়ন [৮] । ইউনিয়ন পরিষদের হাতে স্থানীয় পর্যায়ে ভূমি রেকর্ড, রেজিষ্টেশনের দায়িত্ব পরীক্ষামূলকভাবে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে এবং ট্যাক্স বা খাজনা আদায়ের উপর একটি নির্দিষ্ট কমিশন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দিলে ইউনিয়ন পরিষদের আয় বাড়বে। বর্তমানে শতকরা ১৫ ভাগ কমিশনের

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে অপর কোন ব্যক্তিকে দিয়ে ইউনিয়নের খাজনা আদায় করা হয়। এই ব্যবস্থাটি ইউনিয়ন পরিষদ নিজেদের হাতেই নিতে পারে এবং প্রাপ্ত কমিশনের টাকা নিজেদের মধ্যে বন্টন করতে পারে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হেলথ কার্ড প্রথা চালুকরা যেতে পারে।

ক্ষুদ্র পর্যায়ে কৃষি ঋন যার পরিমান ৩০০০ টাকার বেশী নয় এই রূপ ঋন স্থানীয় পোষ্ট অফিস থেকে দেবার পরিকল্পনা নেয়া যায়। কেননা , পোষ্ট অফিসের কর্মচারীরা সাধারনতঃ স্থানীয় এলাকার মধ্যে থেকেই হন এবং তাদের প্রদত্ত ঋনের টাকা সঠিকভাবে আদায় হবে বলে আশা করা যায়। পোষ্ট অফিসের কর্মচারীরা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারেন [৯]।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ব্যাংক স্থাপন করে গ্রামীন বেকার যুবকদের কৃষি ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে ঋন দেয়া যেতে পারে বলে সমীক্ষায় বেরিয়ে এসেছে। গ্রামীন দুঃস্থ মহিলাদেরকেও ইউনিয়ন ব্যাংকের মাধ্যমেই প্রশিক্ষন প্রদান, ঋন দান ও পন্য বাজার জাতকরনের ক্ষেত্রে সাহায্য করা যেতে পারে। এ সব ঋন দানের বিষয় গুলি ইউনিয়ন পরিষদের সুপারিশ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে করা যেতে পারে।এতে প্রদত্ত ঋন সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো যাবে ও সঠিক সময়ে আদায় হবে বলে আশা করা যায়।

ইউনিয়ন কেন্দ্রীক উন্নয়ন কর্মসূচী এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিপুল অবদান রাখতে পারবে বলে উপরোক্ত মতামতের আলোকে নিসন্দেহে বলা যায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শহর কেন্দ্রীকতা পরিহার করে ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্মসূচী নিলে অচিরেই আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির মেরুদন্ড দৃঢ় ভিত্তির উপর দাড়াবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়। তবে এসব কাজের ভার ইউনিয়ন পরিষদগুলো হাতে হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে কোন শুভ ফললাভ সম্ভব না। ধীরে ধীরে কেন্দ্রীয় সরকার এ সব ক্ষমতা ইউনিয়নের হাতেই ছেড়ে দিতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য , স্থানীয় থানা কর্মকর্তা, থানা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ সবার ক্ষমতার সীমারেখা নির্ধারন করে দেয়া উচিত। ঘুনে ধরা প্রশাসনিক অবকাঠামো দ্রুত পরিবর্তনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকারকে অধিকতর ক্ষমতা দিলে সত্যিকার অর্থে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটতে বাধ্য [১০]। আর এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদই হতে পারে ভবিষ্যত সোনালী বাংলাদেশ গড়ার কেন্দ্রবিন্দু।

Dhaka University Institutional Repository

পাদটীকাঃ

১. সৈয়দ লুৎফর রহমান (১৯৮৮), ইউনিয়ন পরিষদ আইন ম্যানুয়েল,ঢাকাঃ সৈলুর প্রকাশনী, পৃষ্ঠা-মুখবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

২. সৈয়দ লুৎফর রহমান (১৯৮৮),প্রাগুক্ত, মুখবন্ধ থেকে উদ্ধৃত।

৩. দেখুন, Sidney Webb, preface " to John Mathais Village Government in British India (London:T. Fisher Unwin Ltd,1915), p.ix.

৪. দেখুন, Government, of Bengal, "the Resolution on Local self- Government" in supplement to the Gazette of India, 20 May 1882.পৃষ্ঠা- ৭৪৭-৫৩

৫. স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, বাংলাদেশ গেজেট(অতিরিক্ত), ঢাকাঃ ২২শে নভেম্বর, ১৯৭৬।

৬. দেখুন, The Local Government (union parishad) Ordinance, 1983 (Ordinance no 51of 1983). Bangladesh Gezette, Dhaka: 12 septembcr.

৭. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া,''নতুন বছরের স্বপ্ন'',ঢাকাঃ দৈনিক দিনকাল , বর্ষ-১২, সংখ্যা-২৪৩,তারিখ-১/১/১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১৩

৮. দেখুন, Barket-E-Khuda, Rural Development and Change: Study of Bangladesh Village (Dhaka: U.P.L,1988),পৃষ্ঠা- ১

৯. যেহেতু পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে বহু আগের থেকেই পোষ্টাল ব্যাংক, সঞ্চয় প্রকল্প সফল ভাবে চালূ হয়ে আসছে, সে কারনে পোষ্ট অফিসের প্রতি সাধারন মানুষের আস্থা রয়েছে।তাছাড়া মানি-অর্ডার আদান প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পোষ্ট অফিসের কর্মচারীদের প্রতি সাধারন বিশ্বস্ততা এদেশের মানুষের রয়েছে। পোষ্ট অফিসের কর্মচারী এলাকার স্থায়ী লোকজনই সাধারনত হয়ে থাকেন। সে কারনে মোটামুটি ভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে এরা ব্যক্তিগত ভাবে ওয়াকিবহাল থাকেন। ক্ষুদ্র ঋন পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে বিতরন করার ব্যবস্থা করা গেলে ক্ষুদ্র চাষীদের ঋন পেতে সুবিধা হবে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ব্যাংকে মিথ্যা নাম ঠিকানা দিয়ে টাকা ঋন নেবার ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে যাচাই করে নিলে প্রতারক চক্রের হাত হতে ব্যাংকের স্বার্থ রক্ষা হতো। বিস্তারিতর জন্য দেখুন, Koshor C. samal, " Economic and Political weekly, 8 February 1997.

১০. জনপ্রশাসন সংস্কার বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের ভাষন। দেখুন, দৈনিক দিনকাল, ১ আগষ্ট, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃক (১)

নমনায়িত মধ্খালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, চেয়ারম্যান, ফর্মকর্তা, পেশাজীবি, এবং কৃষকবৃন্দের বর্ণনা

নমুনায়ন	সংখ্যা	মন্তব্য
১। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান,(৭ জন বর্তমান এবং ৩ জন সাবেক চেয়ারম্যান সহ)	১০ জন	২জন বর্তমান চেয়ারম্যানকে পাওয়া যায় নাই।
২। নির্বাচিত সদস্য (৭৪ জন বর্তমান এবং ৫ জন সাবেক মেম্বারসহ)	৭৯ জন	৭ জনকে পাওয়া যায় নাই।
৩। মহিলা সদস্যা (২৪ জন বর্তমান এবং ২ জন সাবেক মহিলা সদস্যাসহ)	২৬ জন	৩ জনকে পাওয়া যায় নাই।
৪। কৃষক	৬৮ জন	
৫। সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা (সরকারী ৬ জন + বেসরকারী ১২ জন)	১৮ জন	
৬। পেশাজীবি (স্কুল শিক্ষক, কলেজ শিক্ষক, ডাক্তার, আইনজীবি, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক) (স্কুল শিক্ষক-৫, কলেজ শিক্ষক-৩, ডাক্তার-২, আইনজীবি-৩, ব্যবসায়ী-৮, রাজনীতিক-৮, ছাত্র-৬,অন্যান্য-৪)	৩৯ জন	
	মোট ২৪০ জন	

পরিশিষ্ট ঃক (২)

মধুখালী থানা, ফরিদপুর জেলা এবং বাংলাদেশের মধ্যে তুলনামূলক তথ্যাবলী

ইউনিট	আয়তন (বঃকিঃ)	জনসংখ্যা (১৯৯১, আদমশুমারী)	জনসংখ্যা (১৯৯৬,আনুমানিক)	শিক্ষার হার % ১৯৯৬ (আনুমানিক)
বাংলাদেশ	১৪,৭৫৭০	১১,১৪,৫৫,০০০	১২,২১,০০,০০০	৪৪.৮%
ফরিদপুর	২০৭৩	১৫,০৬,০০০	১৬,৭৮,০০০	৪১.২%
মধুখালী	২৩০	১,৬৬,০০০	১,৮৪,০০০	৪৭.৮%

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical pocketbook of Bangladesh, 1997. (Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা - ১১৩,১২০ মধুখালী থানার তথ্যসমূহ থানানির্বাহী অফিসার (টি.এন.ও) এর কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ক (৩)

বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের সময়কাল

কততম নির্বাচন	নির্বাচনের তারিখ
প্রথম	১১-১২-৭৩ হতে ৩০-১২-৭৩ পর্যন্ত
দ্বিতীয়	১৩-০১-৭৭ হতে ৩১-০১-৭৭ পর্যন্ত
তৃতীয়	২৭-১২-৮৩ হতে ১০-০১-৮৪ পর্যন্ত
চতুর্থ	১২-০২-৮৮
পঞ্চম	২২-০১-৯২ হতে ০৬-০২-৯২ পর্যন্ত

তথ্যসূত্রঃ বিভিন্ন সময়ের জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র সমূহ এবং নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিসমূহ।

পরিশিষ্ট ঃ ক (৪)

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য চিত্র (১৯৬০-১৯৭০)

	১৯৫৯-৬০	১৯৬৪-৬৫	১৯৬৯-৭০
জি.ডি.পি (মিলিয়ন রূপিতে)			
বাংলাদেশ	১৪,৪৮৯	১৭,৯৬৫	২২,৩১৭
পাকিস্তান	১৫,৯৮৪	২১,৭৮৮	২৯,৪৮৪
জনসংখ্যা (মিলিয়ন রূপিতে)			
বাংলাদেশ	৫৩.৯	৬২.৮	৭২.৪
পাকিস্তান	৪৫.০	৫২.০	৫৯.৯
জনপ্রতি আয় (রূপিতে)			
বাংলাদেশ	২৬৯	২৮৬	৩০৮
পাকিস্তান	৩৫৫	৪১৭	৪৯২
বৈষম্যর হার	১.৩২	১.৪৬	১.৬০

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical Digest of Bangladesh, Dhaka, no- 7,1970-71, P.222.(Table:12.3)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ক (৫)

এশিয়া মহাদেশের নির্বাচিত কতিপয় দেশের সংঙ্গে বাংলাদেশের তুলনামূলক চিত্র (১৯৯৫)

দেশের নাম	আয়তন (হাজার বর্গকিঃমিঃ)	জনসংখ্যা (প্রতি বর্গকিঃমিঃ)	মাথাপিছু আয় ডলার হিসাবে	গড় আয়ু	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়নে)
আফগানিস্তান	৬৫২	৩৬		৪৪	২৩.৫
বাংলাদেশ	১৪৮	৭৮০	২৫৪	৫৮	১১৯.৯
ভুটান	৪৭	১৫	৪২০	৪৮	০.৭
মায়ানমার(বার্মা)	৬৭৭	৬৭		৫৯	৪৫.১
চীন	৯৫৬১	১২৬	৬২০	৬৯	১২০০.২
মিসর	১০০১	৫৮	৭৯০	৬৩	৫৭.৮
ভারত	৩২৮৮	২৮৩	৩৪০	৬২	৯২৯.৪
ইন্দোনেশিয়া	১৯০৫	১০১	৯৮০	৬৪	১৯৩.২
ইরান	১৬৪৮	৩৯		৬৮	৬৪.১
ইরাক	৪৩৮	৪৬		৬৬	২০.০
জাপান	৩৭৮	৩৩১	৩৯৬৪০	৮০	১২৫.২
কোরিয়া প্রজাতন্ত্র	৯৯	৪৫৩	৯৭০০	৭২	৪৪.৯
কুয়েত	১৮	৮৮	১৭৩৯০	৭৫	১.৬
মালয়শিয়া	৩৩০	৬১	৩৮৯০	৭১	২০.১
নেপাল	১৪১	১৫১	২০০	৫৫	২১.৪
পাকিস্তান	৭৯৬	১৬৩	৪৬০	৬০	১২৯.৯
ফিলিপাইন	৩০০	২২৮	১০৫০	৬৬	৬৮.৬
সৌদি আরব	২১৫০	৯	৭০৪০	৭০	১৮.৯
শ্রীলংকা	৬৬	২৭৪	৭০০	৭২	১৮.১
থাইল্যান্ড	৫১৩	১১৩	২৭৪০	৬৯	৫৮.২
তুরস্ক	৭৭৯	৭৮	২৭৮০	৬৭	৬১.০

সুত্রঃ World Development Report, 1997, World Bank Atlas, 1997, World Development Indicator, 1997, আরো দেখুন Government of Bangladesh, Statistical pocket book of Bangladesh, 1997 (Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics, January 1998) পৃষ্ঠা-৩৯৭,৩৯৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ক (৬)

বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)

সন	জাতীয় পর্যায়ে	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
১৯৯১	৯২	৬৯	৯৪
১৯৯২	৮৮	৬৫	৯১
১৯৯৩	৮৪	৬১	৮৮
১৯৯৪	৭৭	৫৭	৭৯
১৯৯৫	৭১	৫৩	৭৮
১৯৯৬	৬৭	৫০	৬৯
১৯৯৭	———	———	———
১৯৯৮	———	———	———

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical pocketbook of Bangladesh, 1997.

(Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা - ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃক (৭)

বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুকালের বছরওয়ারী হিসাব

বছর	লিঙ্গ	বাংলাদেশ	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল
১৯৮৮	উভয় লিঙ্গ	৫৬.০	৬০.১	৫৫.৯
	পুরুষ	৫৬.৫	৬১.২	৫৫.৯
	স্ত্রী	৫৬.৬	৬০.১	৫৪.৮
১৯৮৯	উভয় লিঙ্গ	৫৬.০	৬০.১	৫৫.১
	পুরুষ	৫৬.৩	৬০.৩	৫৫.২
	স্ত্রী	৫৫.৬	৬০.২	৫৪.৮
১৯৯০	উভয় লিঙ্গ	৫৫.৯	৬০.২	৫৫.৫
	পুরুষ	৫৬.৪	৬০.৩	৫৬.০
	স্ত্রী	৫৫.৪	৫৯.৭	৫৫.০
১৯৯১	উভয় লিঙ্গ	৫৬.১	৬০.২	৫৬.০
	পুরুষ	৫৬.৫	৬০.৫	৫৬.২
	স্ত্রী	৫৬.৭	৫৯.৮	৫৫.৩
১৯৯২	উভয় লিঙ্গ	৫৬.৩	৬০.৫	৫৬.০
	পুরুষ	৫৬.৮	৬১.০	৫৬.৬
	স্ত্রী	৫৫.৯	৬০.৩	৫৫.৫
১৯৯৩	উভয় লিঙ্গ	৫৭.৯	৬০.৬	৫৭.৭
	পুরুষ	৫৮.২	৬১.৩	৫৭.৭
	স্ত্রী	৫৭.৭	৬০.৪	৫৭.৪
১৯৯৪	উভয় লিঙ্গ	৫৮.১	৬০.০	৫৭.৭
	পুরুষ	৫৮.২	৬১.৩	৫৭.৮
	স্ত্রী	৫৭.৯	৬০.৬	৫৭.৭
১৯৯৫	উভয় লিঙ্গ	৫৮.৭	৬০.৯	৫৭.৯
	পুরুষ	৫৮.৯	৬১.৪	৫৮.০
	স্ত্রী	৫৮.০	৬০.৭	৫৭.৭
১৯৯৬	উভয় লিঙ্গ	৫৮.৯	৬০.৯	৫৮.২
	পুরুষ	৫৯.১	৬১.৭	৫৮.০
	স্ত্রী	৫৮.৬	৬০.৯	৫৮.২
১৯৯৮	উভয় লিঙ্গ	৫৯.৫	———	———
	পুরুষ	৫৯.৫		
	স্ত্রী	৫৯.৫		

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical pocketbook of Bangladesh, 1997. (Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা - ১৫২ এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা - ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ক (৮)

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবহারের পরিসংখ্যান (১৯৮৮-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত)

(হাজার একর হিসাবে)

সন	চাষযোগ্য নয়	বনভূমি	চাষযোগ্য পতিত ভূমি	বর্তমানে চাষ স্থগিত	এক ফসলী অঞ্চল	দো ফসলী অঞ্চল	তিন ফসলী অঞ্চল	মোট বপননযোগ্য এলাকা	মোট চাষাবাদযোগ্য এলাকা
১	২	৩	৪(ক)	৫(খ)	৬	৭	৮	৯	১০(গ)
১৯৮৮-৮৯	৭৬৪৫	৪৭০৩	৮৮৮	৩২৮৫	৮৮২৫	৮৯০৮	২৪১৫	২০১৪৮	৩৩৮৮৭
১৯৮৯-৯০	৭৭৮৩	৪৭০৩	৮৬৩	২৬৮৬	৮৯৮০	৯১৯১	২৪৬৩	২০৬৩৩	৩৪৭৫০
১৯৯০-৯১	৭৯৫৮	৪৬৯৩	১৪৪২	২৩৭৯	৮১৪০	৯৬৩৪	২৪২৪	২০১৯৮	৩৪৬৮০
১৯৯১-৯২	৯৫৩০	৪৬৭৫	১১৮৬	১৫৬৩	৭৭০২	৯৬২৩	২৩৯১	১৯৭১৬	৩৪১২১
১৯৯২-৯৩	১০৩৬২	৪৬৭৫	১০৯৮	১৬৪৩	৬৪১১	৯৯৯৬	২৪৮৫	১৮৮৯২	৩৩৮৫৮
১৯৯৩-৯৪	১০৩৫৫	৪৬৭৩	১৫৬৮	৯৮৪	৭২২৯	৯৪৯৭	২৩৬৪	১৯০৯০	৩৩৩১৫
১৯৯৪-৯৫	১০১২৮	৪৮৬১	১৫৪৭	১০০০	৭২২৮	৯৫৩০	২৩৭৫	১৯১৩৩	৩৩৪১৩

টীকাঃক) চাষযোগ্য পতিত ভূমি চাষাবাদযোগ্য ভূমি, কিন্তু এক বছরের বেশী সময় ধরে ফেলে রাখা হয়েছে। খ)বর্তমানে চাষ স্থগিত ভূমিতে ইতিপূর্বে চাষাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু বর্তমান বছরে চাষাবাদ হয় নি। গ) সম্পূর্ণ ভূমির যোগফলের সমষ্টি।

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical pocketbook of Bangladesh, 1997.

(Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998), পৃষ্ঠা - ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ক(৯)

বাংলাদেশ প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের উৎস

কোটি টাকা

সরকারী খাতে	
ক) পরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ উৎস	৩৯৫২
১। সরকারী খাতে সঞ্চয় (রাজস্ব উদ্বৃত্ত অতিরিক্ত কর মূলধন ইত্যাদি)	১৬১৮
২। বৈদেশিক সাহায্য ও স্কীম	১৭০৭
৩। ব্যাংক থেকে ঋন	১৫৭
৪।বেসরকারী খাত থেকে ঋন	৪৭০
বেসরকারী খাতে	
খ)পরিকল্পিত ব্যয় বরাদ্দ উৎস	৫০৩
১। সরাসরি অর্থ বিনিয়োগ	২৫০
২। ব্যাংক থেকে ঋন	২০৩
৩। বিদেশ থেকে ঋন	৫০
পরিকল্পনার আয়তন= ৩৯৫২+ ৫০৩ = ৪৪৫৫ কোটি টাকা	

সূত্রঃ প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮), পরিকল্পনা কমিশন, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট- ক (১০)

বাংলাদেশের দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-১৯৮০) খাতওয়ারী ব্যয়-বরাদ্দের তালিকা।

কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	খাত	সরকারী খাত	বেসরকারী খাত	মোট ব্যায়	শতকরা অংশ
১	কৃষি, গ্রাম্য প্রতিষ্টান ও পানি সম্পদ	৮৯৮	৭০	৯৬৮	২৫%
২.	শিল্প	৫৭০	২৪৬	৮১৬	২২%
৩.	শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও কারিগরী গবেষনা	৪৭১		৪৭১	১২%
৪.	পরিবহন ও যোগাযোগ	৫৮০	১২৬	৭০৬	১৮%
৫.	প্রাকৃতিক পরিকল্পনা ও গৃহায়ন	২৫০	১৪০	৩৯০	১০%
৬.	শিল্প প্রশাসন ও প্রশিক্ষন	১৮০		১৮০	৫%
৭.	স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, পরিবার পরিকল্পনা, শ্রম ও সমাজকল্যান।	২৫০		২৫০	৬%
৮	উন্নয়ন বোর্ড ও অন্যান্য	৬২	১৮	৮০	২%
	সর্বমোট	৩,২৬১	৬০০	৩৮৬১	১০০%

সুত্রঃ বাংলাদেশের দ্বি-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)ঃ

চলচিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ, তথ্য-ও বেতার মন্ত্রনালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।আরো দেখুন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বই ১৯৭৯, পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়। পৃষ্ঠাঃ ৭৯৪-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ক (১১)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৮০-৮৫) অর্থসংস্থানের উৎস

ক্রমিক নং	উৎস সমূহ	টাকার অংক (কোটি টাকায়)
১।	অভ্যন্তরিন উৎস	১১,৭১৫
২।	সরকারী রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৬,৫৫৫
৩।	বেসরকারী সঞ্চয় ও ষ্টক থেকে ঋন	৫,১৬০
৪।	আভ্যন্তরীন সঞ্চয়	৬,১৩০
৫।	নীট বৈদেশীক ঋন	১৩,৮৮০

সূত্রঃ বাংলাদেশের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫), প্লানিং কমিশন, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সাপ্তাহিক রোববার, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ক (১২)

সংশোধিত ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা, সাফল্য ও ব্যর্থতার খতিয়ান (১৯৮০-৮৩)

ক্রমিক	বিষয়	মূল লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	ফলাফল
১।	জি.ডি.পি বৃদ্ধির হার (শতকরা হার প্রতি বছর)	৭.২	৫.৪	৩.৬
২।	জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার (প্রতি বছর)	২.২	২.৪	২.৫
৩।	মাথা পিছু জি.ডি.পি (বছর শেষে)	৯৪২	৮৬৫	৭৭০
৪।	খাদ্য উৎপাদন (মিলিয়ন টন বছর শেষে)	২০.০৩	১৭.৫	১৫.১
৫।	নতুন কর্মসংস্থান (মিলিয়ন বছর শেষে)	৫.১৮	৩.৬৫	
৬।	প্রাথমিক শিক্ষা (মিলিয়ন বছর শেষে)	১৩.০০	১৩.০০	
৭।	উন্নয়ন ব্যয়	২৫৫,৯৫০	১৭২,০০০	
৮।	উন্নয়ন প্রকল্পে বৈদেশীক সাহায্য ওঋনের পরিমান	৪৬.৩	৪১.২	
৯।	অভ্যন্তরিন সঞ্চয় (বছর শেষে)	৭.২	৭.৪	
১০।	ট্যাক্স জি.ডি.পির অনুপাত (বছর শেষে)	১৩.০	৯.৫	৮.১

সূত্রঃ প্লানিং কমিশন, অর্থও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার এবং রোববার, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ ক (১৩)

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সেচের আওতাধীন ভূমির পরিমান (১৯৯০-৯১ থেকে ১৯৯৫-৯৬)

(হাজার একরে)

সেচ প্রক্রিয়া	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৫-৯৬
আধুনিক সেচ প্রক্রিয়া সমূহঃ পাওয়ার পাম্প	১৬৬৮	১৬৯২	১৬৯৬	১৬৫১	১৬২৩
টিউবওয়েল	৪৪০৪	৪৮৯৭	৪৯৭৩	৫১৯৯	৫৫৩৭
খাল খনন	৪২৭	৪২১	৩৯২	৩৮৩	৩৯৩
প্রাচীন সেচ প্রক্রিয়া সমূহঃ (দোন,ইত্যাদির মাধ্যমে)	৯৮০	৯৬৮	৯৭৭	৮৯৩	৯১৯
মোট ভূমির পরিমান	৭৪৭৯	৭৯৭৮	৮০৩৮	৮১২৬	৮৪৭২

টীকাঃ দোন ত্রিকোনাকৃতির আধার বা পাত্র। সাধারনতঃ গ্রামীন অঞ্চলে পানি সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical pocketbook of Bangladesh, 1997.

(Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, January, 1998) পৃষ্ঠা - ২০১

পরিশিষ্ট-ক (১৪)

কৃষি ও গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নখাতে সরকারের ব্যয় বরাদ্দ (১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৭)

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত সমূহ	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭
কৃষি	৪৪০৯	৪৩৬১	৬৫৬০	৪৭৯৮	৫১৩১
গ্রামীন উন্নয়ন	৫৭৭৫	৪৯৮২	৩৩৫৮	৬৮১৯	৭২৯৩
সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যয়	৬৫৪০৪	৮৯৮৩০	১০৩০৩০	১০০১৫৭	১০৭১২০

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical pocketbook of Bangladesh, 1997.

(Dhaka : Bangladesh of Bureau of Statistics, January, 1998) পৃষ্ঠা - ২৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ ক (১৫)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এ.ডি.পি) বছর ওয়ারী খতিয়ান (১৯৮৬-৮৭ থেকে ১৯৯৬-৯৭)

অর্থ বছর	সংশোধিত(এডিপি) কোটি টাকায়	প্রকৃত খরচ	গৃহিত প্রকল্পের সংখ্যা	কার্যসম্পন্ন প্রকল্পের সংখ্যা
১৯৮৬-৮৭	৪৫১৩	৪৪৩৯	৮৪২	১০৮
১৯৮৭-৮৮	৪৬৫১	৪১৫০	৮৮০	৯৯
১৯৮৮-৮৯	৪৫৯৫	৪৬২২	৯২৯	৮৮
১৯৮৯-৯০	৫১০৩	৫৭৩৮	৯২৫	১৮০
১৯৯০-৯১	৬১২৬	৫২৬৯	৭৭৮	১৮৩
১৯৯১-৯২	৭১৫০	৬০২৪	৮৯১	১৫৭
১৯৯২-৯৩	৮১২১	৬৫৫০	৯২৮	১১৯
১৯৯৩-৯৪	৯৬০০	৮৯৮৩	৯৯২	১৩৬
১৯৯৪-৯৫	১১১৫০	১০৩০৩	১০৯৫	১৭৪
১৯৯৫-৯৬	১০৪৪৭	১০০১৬	১২০১	১৫৮
১৯৯৬-৯৭	১১৭০০	১১০৪১	১২২৭	১৮৮

সূত্রঃ Government of Bangladesh, Statistical pocketbook of Bangladesh, 1997. Bangladesh Bureau of Statistics,Dhaka ,পৃষ্ঠা - ৩৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ খ

সাক্ষাৎকার পর্ব ঃ১ (কৃষকদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের জন্য)

- (আপনার প্রদত্ত মতামতের গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে)
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আপনি কত বছর যাবৎ অত্র এলাকায় বসবাস করছেন? .....বছর।

২। আপনার বসতবাড়ী থেকে সবচেয়ে কাছের শহর কতদূরে? ..... মাইল।

৩। আপনি মাসে কতবার শহরে আসেন? ..... বার।

৪। আপনার শহরে আসার উদ্দেশ্য কি?

_____

_____

৫। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? নিরক্ষর/প্রাথমিক বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/তদূর্ধ পর্যন্ত।

৬। আপনার বর্তমান বয়স কত? ..... বছর।

৭। আপনার কতটুকু জমি রয়েছে?

নিজ নামে .....একর।

বাবার জমি.....একর।

পারিবারিক যৌথ সম্পত্তি .....একর।

৮। আপনি কি একজন ভাগচাষী? হাঁ/না।

৯। (যদি হাঁ হয়) আপনার জমির পরিমান কত? .....একর।

১০। আপনি কি আপনার জমি ভাগচাষে দিয়েছেন? হাঁ/না।

১১। (যদি হাঁ হয়) কতখানি জমি দিয়েছেন? .....একর।

১২। আপনার আয়ের আর কোন উৎস আছে কি? হাঁ/না।

১৩। (থাকলে) ঐ খাতসমূহ হতে বাৎসরিক কত টাকা আয় হয়? .....টাকা।

১৪। কৃষিখাত থেকে বাৎসরিক কত টাকা আসে? .....টাকা।

১৫। আপনার কতখানি জমি সেচের আওতাধীন? .....একর।

১৬। আপনি কি প্রক্রিয়ায় জমিতে সেচ দেন?

(ক) টিউবওয়েল / পাওয়ার পাম্পের সাহায্যে।

(খ) সেচ প্রনালীর মাধ্যমে। (গ) সম্মিলিত প্রক্রিয়ায় (ক এবং খ অনুযায়ী)

Dhaka University Institutional Repository

১৭। আনুগ্রহপূর্বক নিচের কৃষি উপকরনের কোনটি আপনি ব্যবহার করে থাকেন সে সম্পর্কিত তথ্য দিন?

উপকরন	হাঁ	না
রাসায়নিক সার ব্যবহার		
উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার		
ফসলবুনন যন্ত্রের ব্যবহার		
ট্রাক্টর/ পাওয়ার টিলারের ব্যবহার		
কীটনাশক ব্যবহার		

১৮। নিম্নোক্ত কৃষিব্যবস্থা / উপকরন সর্ম্পকে আপনার মতামত কি?

উপকরন	ভাল	মন্দ	মাঝারী	নিরুত্তর
রাসায়নিক সার ব্যবহার				
উচ্চ ফলনশীল বীজ ব্যবহার				
ফসলবুনন যন্ত্রের ব্যবহার				
ট্রাক্টর/ পাওয়ার টিলারের ব্যবহার				
কীটনাশক ব্যবহার				

১৯। কৃষিখাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে আপনি কোন ঋন নিয়েছেন কি? হাঁ/না।

২০। কৃষিখাতে আপনার ঋনের পরিমান কত?

ঋনের খাত	টাকা	বাৎসরিক সুদ
কৃষিখাতে ঋন		
মৎস্যখাতে ঋন		
পোলট্রি খাতে ঋন		
গবাদিপশু খাতে ঋন		

২১। নিম্নের সুবিধা পেতে কি আপনার কোন অসুবিধা হয়?

সুবিধা সমূহ	হাঁ	না
ঋন		
রাসায়নিক সার		
উচ্চ ফলনশীল বীজ		
সেচ সুবিধা		
কীটনাশক		
অন্যান্য		

Dhaka University Institutional Repository

২২। (অসুবিধা হলে কি কি অসুবিধা ভোগ করে থাকেন তা বর্ণনা করুন।

২৩। গৃহীত ঋন কি আপনার জন্য যথেষ্ট? হাঁ/না।

২৪। ঋন বাদে প্রয়োজনের সময় আপনি কোথায় হতে টাকার ব্যবস্থা করেন? .....

২৫। আপনি কি আপনার ঋনের সমুদয় অর্থই খরচ করেন? হাঁ/না।

২৬। (না বোধক হলে) ঋনের বাকী টাকা কিভাবে খরচ করেন? .....

২৭। আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য কি? হাঁ/না।

২৮। আপনি কি দলীয় তহবিলে চাঁদা দেন? হাঁ/না।

২৯। ইউনিয়ন পরিষদের নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের সংগে আপনার দেখা হয়-

চেয়ারম্যান ঃ প্রতিদিন/সপ্তাহে কয়েক দিন/মাসে একবার।

মেম্বার ঃ প্রতিদিন/সপ্তাহে কয়েক দিন/মাসে একবার।

ইউনিয়ন সচিব ঃ প্রতিদিন/সপ্তাহে কয়েক দিন/মাসে একবার।

৩০। তাদের কাছ থেকে কি প্রার্থিত সহযোগিতা পান? হাঁ/না।

৩১। চেয়ারম্যান/মেম্বারেরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করেন?.....

৩২। আপনি কি নিয়মিত ইউনিয়ন পরিষদের খাজনা পরিশোধ করেন? হাঁ/না।

৩৩। আপনার এলাকার সাধারন সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন?

১। বিদ্যালয়ের সমস্যা	৫। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি
২। চিকিৎসা সমস্যা	৬। সেনিটেশন সমস্যা
৩। রাস্তা ও পুলের সমস্যা	৭। কৃষি উপকরনের অভাব
৪। বিশুদ্ধ খাবার পানির সমস্যা	৮। কৃষি মালের বাজারজাতকরনের সমস্যা

৩৪। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদের হাতে কোন কাজটি ছেড়ে দেওয়া উচিত?

৩৫। ইউনিয়নে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে ইউনিয়ন পরিষদ কি করতে পারে? (বর্ণনা করুন)

৩৬। আপনি কি মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদের হাতে খাজনা আদায়, ভূমি জরিপ, ও রেজিষ্ট্রেশন করার ক্ষমতা দিলে তারা তা সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে? হাঁ/না।

৩৭। (যদি না হয়) কারনগুলো কি কি?

Dhaka University Institutional Repository

৩৮। আপনার মতে ইউনিয়ন ভিত্তিক কেন্দ্রীয় ক্রয়কেন্দ্র / শস্যগুদাম গড়ে তোলা ভাল হবে কি? হাঁ/না।

৩৯। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়ন পরিষদের কার্যদক্ষতা বিবেচনা করুন।

কাযক্রম	ভাল	মন্দ	মোটামুটি	নিরুত্তর
খাজনা আদায়				
রাস্তা-পুল তৈরী ও মেরামত				
বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ				
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা				
ত্রাণ বন্টন কার্যক্রম				
স্বাস্থ্য-সেবা প্রদান				
কৃষি উপকরন সরবরাহ				
অন্যান্য (যদি থাকে)				

৪০। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইউনিয়ন পরিষদকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায়?

_____

_____

৪১। মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপের ব্যবস্থা গ্রহন সুফল বয়ে আনবে কি? হাঁ/না।

৪২। আপনার কয় ছেলে মেয়ে ?_____ জন।

৪৩। আপনি কি পরিবার-পরিকল্পনার কোন পদ্ধতি গ্রহন করেছেন? হাঁ/না।

৪৪। আপনার স্ত্রী নিজে কি বাড়তি কোন আয় করেন? হাঁ/না।

৪৫। (যদি করেন) তার মাসিক উপার্জন কত? _____টাকা।

৪৬। আপনি যদি আরোও কোন তথ্য দিতে চান দিতে তবে দিতে পারেন?

_____

_____

_____

নাম ঃ_____

গ্রাম ঃ_____

ওয়ার্ড নং ঃ_____

ইউনিয়ন ঃ_____

থানা ঃ_____

জেলা ঃ_____

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্টঃ খ

সাক্ষাৎকার পর্ব-২ (অফিসারদের সাক্ষাৎকার)

- আপনার প্রদত্ত তথ্যর গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে।
- যেখানে প্রয়োজন সে স্থানে অনুগ্রহপূর্বক টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আপনি কতদিন যাবৎ অত্র এলাকায় কর্মরত আছেন?_____ বছর_____মাস।

২। আপনার পদবী কি? _____।

৩। আপনি কি থানা সদরে থাকেন? হাঁ/ না।

৪। (যদি হাঁ হয়) আপনি কোথায় অবস্থান করেন?
সরকারী কোয়ার্টার/ বেসরকারী ভবন।

৫। আপনার বয়স কত? _____ বছর।

৬। আপনি কোথায় জন্মগ্রহন করেন?
গ্রাম এলাকায়/ মফস্বল শহরে/ শহরে।

৭। আপনি শিক্ষাজীবনের বেশীর ভাগ সময় কোথায় কাটিয়েছেন? গ্রাম এলাকায়/ মফস্বল শহরে/ শহরে।

৮। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? _____।

৯। আপনার পিতার পেশা কি? চাকুরী/ ব্যবসা/ অন্যান্য।

১০। আপনার পিতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? _____।

১১। আপনার মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? _____।

১২। আপনার মাতা কি কোন কাজে নিয়োজিত ছিলেন? হাঁ/না।

১৩। (থাকলে) আপনার মাতার মাসিক আয় কত? _____টাকা।

১৪। আপনার পিতার মাসিক আয় কত? _____টাকা।

১৫। আপনার মতে অত্র থানার অর্ন্তগত ইউনিয়নের পাঁচটি সমস্যা চিহ্নিত করুন যার আশু সমাধান হওয়া জরুরী?

ক)_____

খ)_____

গ)_____

ঘ)_____

ঙ)_____

Dhaka University Institutional Repository

১৬। স্থানীয় জনসাধারন কি তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার কাছে সাহায্যর জন্য আসে? হাঁ/না।

১৭। (হাঁ হলে) আপনি তাদের কিভাবে সাহায্য করেন?

১৮। (সাহায্য না করলে) এক্ষেত্রে সাহায্য না করার কারন কি?

১৯। আপনার দপ্তরে কোন শ্রেনীর লোকের যাতায়াত বেশী?

২০। আপনার কাজের জন্য কখনো স্থানীয় জনসাধানের বাধার সম্মুখীন হয়েছেন কি? হাঁ/না।

২১। (হাঁ হলে) কি কারনে বাধার সম্মুখীন হন? _____।

২২। আপনার উপর অর্পিত বাজে কি কোন বিশেষ গোষ্ঠি হস্তক্ষেপ করে থাকেন? হাঁ/না।

২৩। (যদি হাঁ হয়) সাধারনতঃ কোন ধরনের গোষ্ঠি হস্তক্ষেপ করে থাকে?_____।

২৪। আপনি কি আপনার কাজে অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের সার্বিক সহযোগীতা পান? হাঁ/না।

২৫। (না হলে) কারন বর্ণনা করুন।

২৬। আপনার মতে দ্রুত কৃষি উন্নয়নে সরকারের কি কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত?

২৭। আপনি কি মনে করেন ইউনিয়ন পরিষদ নেতৃবৃন্দ সমাজ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারবে? হাঁ/না

২৮। (না হলে) কেন পারবে না?

২৯। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদকে অধিক কার্যক্ষম করতে কি কি পন্থা গ্রহন করা উচিত? (সুনির্দিষ্ট করে ব্যাখ্যা করুন)

৩০। আপনি কি মনে করেন জনগনকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত করা উচিত? হাঁ/না।

৩১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখতে হলে ইউনিয়ন পরিষদকে কিভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে?

৩২। অত্র গবেষনায় সহায়ক হতে পারে এমন কোন পরামর্শ থাকলে বর্ণনা করুন?

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ খ

সাক্ষাৎকার পর্ব-৩ (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ মেম্বারদের সাক্ষাৎকারের জন্য)

১। আপনি এই ইউনিয়নে কত বছর যাবত বসবাস করছেন? _____ বছর।

২। আপনার ইউনিয়ন থেকে নিকটবর্তী শহর কতদুরে? _____ মাইল।

৩। আপনি গত এক মাসে কয়বার সেখানে গিয়েছেন? _____ বার।

৪। আপনার সফরের উদ্দেশ্য কি ছিলো? _____।

৫। আপনি রেডিও-টেলিভিশনের নিম্নোক্ত অনুষ্ঠান সমূহ দেখে বা শুনে থাকেন কিনা।

বিষয়াবলী	প্রত্যহ	অনিয়মিত	না
সংবাদ			
কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান			
পরিবার পরিকল্পনা অনুষ্ঠান			
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান			

৬। আপনার বয়স কত? _____ বছর।

৭। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? _____।

৮। আপনার পেশা কি? _____।

৯। আপনি নিম্নোক্ত সংবাদপত্র সমূহ পড়ে থাকেন কি?

সংবাদপত্রের নাম	নিয়মিত	অনিয়মিত	না
ইত্তেফাক			
জনকণ্ঠ			
দিনকাল			
ইনকিলাব			
আজকের কাগজ			
বাংলাদেশ অবজারভার			
সংবাদ			
অন্যান্য			

Dhaka University Institutional Repository

১০। নিম্নোক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা সমূহ পড়েন কি?

সংবাদপত্রের নাম	নিয়মিত	অনিয়মিত	না
রোববার			
যায়যায় দিন			
কুরিয়ার (ইংরেজী)			
অন্যান্যঃ			

১১। আপনার আয়ের উৎস কি?_____।

১২। আপনার বাৎসরিক সর্বমোট আয় কত? _____।

১৩। আপনার পিতা মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? _____।

১৪। আপনার পিতার পেশা কি? _____।

১৫। আপনার জমির পরিমান কতটুকু?

নিজের নামে _____ একর।

বাবার নামে _____একর।

পারিবারিক যৌথ সম্পত্তি _____একর।

১৬। আপনার পরিবারের সদস্যদের বর্ণনা দিন।

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	আপনার সঙ্গে সম্পর্ক	বয়স	পেশা	আয়(বাৎসরিক)

১৭। আপনি কি পরিবার পরিকল্পনার কোন পদ্ধতি গ্রহন করেছেন? হাঁ/না।

১৮। আপনি কি একজন ভাগ চাষী? হাঁ/ না।

১৯। (হাঁ হলে) কতটুকু জমি ভাগে চাষ করান? _____একর।

২০। জমি চাষে আপনি কি পদ্ধতি অবলম্বন করেন

ক) গরুর লাঙ্গল।

খ) ট্রাক্টর/ পাওয়ার টিলার

গ) যৌথ প্রক্রিয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

২১। গত বছর আপনার জমিতে কি কি ফসল ফুনেছেন?

শস্য	জমির পরিমান	একর প্রতি ফলন	আয়
ধান			
পাট			
ইক্ষু			
গম			
অন্যান্য (বর্ণনা দিন)			
অন্যান্য (বর্ণনা দিন)			

২২। নীচের কৃষি উপকরন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

কৃষি উপকরন	ভাল	মন্দ	মোটামুটি	নিরুত্তর
রাসায়নিক সার				
উচ্চ ফলনশীল বীজ				
বীজ রোপন যন্ত্র				
ট্রাক্টর/পাওযার টিলার ব্যবহার				
সেচ সুবিধা ব্যবহার				
কীটনাশক ব্যবহার				

২৩। আপনি কি নিম্নোক্ত কৃষি উপকরন পাবার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন?

কৃষি উপকরন	হাঁ	না	নিরুত্তর
ধান			
রাসায়নিক সার			
উচ্চ ফলনশীল বীজ			
কীটনাশক			
সেচ সুবিধা			
অন্যান্য (বর্ণনা দিন)			

২৪। (যদি হাঁ হয়) কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন?

_____

_____

২৫। আপনার কতখানি জমি সেচের আওতাধীন? .....একর।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। কি প্রক্রিয়ায় আপনি তাতে সেচ দেন? _____।

২৭। গতবছর আপনি কি পরিমান ঋন নিয়েছেন?

ঋন খাত	ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান	টাকা	দেয় সুদ
শিল্প ঋন			
কৃষিখাতে ঋন			
মৎস্য ঋন			
হাসমুরগীখাতে ঋন			
গবাদিপশুখাতে ঋন			
অন্যান্য			
		মোট টাকাঃ	

২৮। (যদি ঋন নিয়ে থাকেন) প্রাপ্ত ঋন কি পর্যাপ্ত? হাঁ/না।

২৯। ঋন পর্যাপ্ত না হলে আপনি বাকী টাকার যোগান কোথা থেকে পান?

ক)স্থানীয় মহাজন খ) আত্মীয়-স্বজন/ বন্ধু-বান্ধব গ) অন্যান্য উৎস

৩০। প্রাপ্ত কৃষি ঋনের সমুদয় অর্থই কি আপনি ব্যয় করেন? হাঁ/না।

৩১। (যদি না হয়) কিভাবে বাকী ঋনের অর্থ ব্যয় করেন?

ব্যয়ের খাত	সামান্য অর্থ	বেশী অর্থ
সামাজিক আনুষ্ঠানাদিতে		
পূর্বের ঋন শোধ করতে		
পূর্বপুরুষের দেনা শোধ করতে		
জমি ক্রয়		
ছেলে-মেয়ের শিক্ষা খাতে		
খাদ্য ক্রয়		
চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে		
বস্ত্র ক্রয়		
অন্যান্য		

৩২। আপনি কি মনে করেন সরকার গৃহিত পদক্ষেপ সঠিক? হাঁ/না।

৩৩। ইউনিয়নের জনগনের কাছ থেকে কি নিয়মিত খাজনা পান? হাঁ/না।

৩৪। সরকারের কাছে কৃষি উন্নয়নে আপনার কোন পরামর্শ আছে কি? (বর্ণনা করুন)

_____

_____

৩৫। আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক কি ? হাঁ/না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

382762

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। আপনি কতদিন যাবৎ ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যুক্ত? _____বছর।

৩৭। আপনি ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে দিনে কয়বার যান? _____বার।

৩৮। আপনি এলাকার মানুষকে কিভাবে সাহায্য করে থাকেন?

ক) পরামর্শ দিয়ে

খ) কাজ করে দিয়ে

গ) প্রয়োজনীয় দপ্তরে নিয়ে যেয়ে

ঘ) আর্থিক সহায়তা দিয়ে

৩৯। ইউনিয়ন পরিষদের সভায় সাধারনত কি কি বিষয়ে আপনি আলোচনা করেন?

_____

৪০। আপনি নিজে কি ইউনিয়ন পরিষদের খাজনা পরিশোধ করেন? হাঁ/ না।

৪১। আপনি কি মনে করেন স্থানীয় প্রভাবশালী মহল ইউনিয়ন পরিষদের কাজে হস্তক্ষেপ করে থাকে? হাঁ/না ।

৪২। ইউনিয়ন পরিষদে আপনার কোন প্রস্তাব গৃহিত হয়েছে কি? হাঁ/না।

৪৩। (হয়ে থাকলে) কি প্রস্তাব?

_____

৪৪। আপনি কি মনে করেন আপনাকে প্রদত্ত সরকারী সম্মানী যথেষ্ট? হাঁ/না।

৪৫। আপনার মতে ইউনিয়ন পরিষদ সম্পর্কে মানুষের ধারনা কেমন? ভাল/মন্দ/বুঝা যায় না।

৪৬। ইউনিয়ন পরিষদের হাতে ভূমিজরিপ, রেকর্ড, খাজনা আদয় ও রেজিষ্ট্রেশনের দ্বায়িত্ব দেয়া যায় কি?হাঁ/না।

৪৭। নিম্নোক্ত অফিস সমূহে গত মাসে কয়বার গিয়েছেন?

অফিস সমূহ	কতবার	যাবার কারন
সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন)		
ব্যাংক/ সমবায়-সমিতি		
কৃষি অফিস		
থানা, পুলিশ ষ্টেশন		
কোর্ট (দেওয়ানী/ ফৌজদারী)		
অন্যান্য		

৪৮। এ সব অফিস থেকে কি প্রয়োজনীয় সহোযোগীতা পেয়েছেন? হাঁ/না।

৪৯। সরকারী কর্মকর্তারা ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে এলে সাধারনত কোন কোন বিষয়ে পরামর্শ দেন?

_____

_____

Dhaka University Institutional Repository

৫০। ইউনিয়ন পরিষদের উপর সরকারী ক্ষমতা চর্চার ক্ষেত্র কি কি?

আমলাতান্ত্রিক | অর্থনৈতিক | রাজনৈতিক | অন্যান্য

৫১। এসব নিয়ন্ত্রন ইউনিয়ন পরিষদের কাজে ক্ষতি করে কি? হাঁ/না।

৫২। সরকার কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থ প্রেরন করলে সুবিধা হবে কি? হাঁ/না।

৫৩। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালী করতে হলে কি ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন? (ব্যাখ্যা করুন)

৫৪। আপনার ইউনিয়নের কৃষিজাত / শিল্পজাত পন্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরনের ব্যবস্থা আছে কি? হাঁ/না।

৫৫। (না থাকলে) এ ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়?

৫৬। কৃষি উন্নয়ন / শিল্প উন্নয়নে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র গঠন করলে কি সুফল আসবে? হাঁ/ না।

৫৭। সংসদীয় কমিটিতে ও মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি রাখা যায় কি? হাঁ/ না।

৫৮। সরকারী ঋন দান কর্মসূচী ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সীমিত পর্যায়ে করা সম্ভব কি? হাঁ/না।

৫৯। প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ব্যাংক স্থাপন কি যুক্তি সংগত? হাঁ / না।

৬০। ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ব্যবস্থা সুফল বয়ে আনবে কি? হাঁ/না।

৬১। ইউনিয়ন ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প চালু করা উচিত কি? হাঁ/না।

৬২। এই গবেষার সংগে সম্পর্কিত বিষয়ে আপনার কোন মতামত থাকলে বর্ণনা করুন?

নামঃ

গ্রামঃ

ইউনিয়নঃ

থানাঃ

জেলাঃ

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঃ গ

মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা

সাফল্যজনকভাবে মাঠ পর্যায়ের কাজ সুম্পন্নের উপরই যে কোন গবেষণা কাজের সফলতা অনেকাংশে নির্ভরশীল। বহু গবেষক গবেষনা পরিকল্পনা গ্রহনের আগে পদ্ধতিগতভাবে ও মানসিকভাবে গবেষনা কর্মের জন্য ভালভাবে প্রস্তুত থাকেননা।গবেষনার মতো একটি জটিল কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ের নানাবিধ বাধা-বিঘ্ন সম্পর্কে সঠিক সচেতনতার অভাবে বাধ্য হয়ে অনেক গবেষক মাঝপথে গবেষনার কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।

এ অধ্যায়ে বর্তমান গবেষনাকর্ম চালাতে গিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে সব বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি তার সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরেছি। এই কার্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিবৃতিটিকে বর্তমান অভিসন্দর্ভের একটি অতিরিক্ত অংশ হিসাবে ধরা যেতে পারে।যদিও গবেষনা কর্মে যে কোন গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, তবে ভবিষ্যতে নতুন গবেষক হিসাবে যারা মাঠ পর্যায়ের গবেষনামূলক কাজ করতে যাবেন। তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধারনার জন্য এই অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা সহায়ক হবে বলে মনে করি।

অত্র গবেষনার মাঠ পর্যায়ের কাজটি বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার মধুখালী থানাকে (পশ্চিমা দেশের ''কাউন্টি'' এবং ভারতের ''ব্লক'' সমতুল্য) কেন্দ্র করে ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস কাল যাবত সম্পন্ন করা হয়েছে। মধুখালী থানা (সাবেক মধুখালী উপজেলা) ফরিদপুর জেলা সদর থেকে কম-বেশী ১২ কিঃমিটার দূরে এবং রাজধানী শহর ঢাকা থেকে এর দুরত্ব কমবেশী ১৫৭ কিলোমিটার। ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের শেষ স্থান আরিচা ফেরীঘাট হতে পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে অপর পাড় দৌলতদিয়া ফেরী ঘাট। যা, রাজবাড়ী জেলার অর্ন্তগত । দৌলতদিয়া ফেরী ঘাট হতে যশোহর-খুলনা মহাসড়ক ধরে এগিয়ে গেলে প্রায় ৬৮ কিলোমিটার পরে মহাসড়কের পাশে মধুখালী থানা অবস্থিত। মধুখালী থানা নয়টি ইউনিয়ন পরিষদের সম্বন্বয়ে গঠিত (তৃণমুল পর্যায়ের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবস্থা) এবং জনসংখ্যার হার প্রায় ১,৬৬,০০০ (১৯৯১)।বর্তমানে এর জনসংখ্যা আনুমানিক ১,৮৪,০০০ জন (১৯৯৬)। এই থানার আয়তন প্রায় ২৩০ বর্গমাইল । জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গমাইলে প্রায় ৭২২ জন (১৯৯১) এবং বর্তমানে এই ঘনত্ব প্রায় ৮০০ জন (আনুমানিক)।

ফরিদপুর জেলা শহরের তুলনায় (৫০.৭ ভাগ) মধুখালী থানার শিক্ষার হার বেশ কম শতকরা ৪৭.৮ভাগ। মধুখালী থানা মূলতঃ কৃষি নির্ভরশীল। ফরিদপুর চিনি কল (স্থানীয়ভাবে মধুখালী সুগার মিল নামে পরিচিত) মধুখালী থানা সদরে অবস্থিত বিধায় এ অঞ্চলের কৃষি অর্থনীতি অনেকটা এই মিলের উপর নির্ভরশীল। এই মিল ও এর আশেপাশে কয়েকটি ইউনিয়নে

Dhaka University Institutional Repository

আখের চাষ করা হয়ে থাকে (স্থানীয়ভাবে এখানে আখকে বলা হয় ''কুশর'') এই থানা বেশ কর্ম চঞ্চল একটি এলাকা এবং আমার দেখা মতে এখানকার কেন্দ্রীয় বাজারটি বেশ বৃহৎ। ব্যবসা প্রধান অঞ্চল হিসাবে প্রতিদিন আশেপাশের জেলাগুলো হতেও বিপুল সংখ্যক লোকের সমাগম ঘটে এই বাজারে।

গবেষনা কর্মটি যেহেতু ইউনিয়নকে কেন্দ্রকরে কিভাবে অর্থনৈতিক স্বয়ংভরতা আনয়ন করা যায় তার উপায় নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পরিচালিত ছিল, সুতরাং সেই লক্ষ্যে মধুখালী থানার ৯টি ইউনিয়নের বিভিন্ন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন মেম্বার, মহিলা সদস্যা, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, কলেজ ও স্কুল শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-কৃষক, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন এন.জি.ও এবং সমাজ কল্যানমূলক প্রতিষ্ঠানের সংগে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সংগে আলাপ করতে হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠন, মসজিদ-মাদ্রাসা, মন্দিরের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের সাথেও আলাপ আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্বদের মতামত যত্নের সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এসব সাক্ষাৎকার পর্বে গবেষক ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ক্লাস রুমের গন্ডী পেরিয়ে বাইরের জগত সম্পর্কে , বিশেষত গ্রাম জীবন সম্পর্কিত এ অভিজ্ঞতার মূল্য বাস্তব জীবনে অপরিসীম ও অপরিহায্য বলে গবেষক মনে করেন। অত্র গবেষনা কর্মে মধুখালী থানায় গবেষনা কর্ম চালানোর সময় যেসব বিচিত্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি তার সম্পূর্ণ তালিকা দিলে সহজে শেষ হবে না । তবে সাধারনভাবে যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলো হলো- ১)আপনি কে? (এবং এর সংগে আরো কিছু আনুসাংগিক প্রশ্ন, যেমন-কোথায় থাকেন? কি করেন? ইত্যাদি), ২) আপনি আমাদের এখানে কি কাজে এসেছেন?, ৩) আপনি কেন এসব কাজ করছেন?, ৪) আপনি কি সরকারী লোক?,৫) সরকার কি কোন গোপন কাজে চর হিসাবে আপনাকে পাঠিয়েছেন?, ৬) সরকার কি আপনার এ কাজে টাকা দিচ্ছেন?, ৭) আপনার এ কাজে কি. ফলাফল আমরা পাব?, ৮) আপনি সাক্ষাৎকার নেবার জন্য বিশেষভাবে আমাকেই কেন বেছে নিয়েছেন?, ৯) আমার ব্যক্তিগত তথ্য জেনে আপনার কি লাভ হবে?, ১০) সরকার কি ইউনিয়ন পরিষদকে উপজেলার মত ক্ষমতা দিবে?, ১১) সরকার কি ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি সরকারী সাহায্য/অনুদান দিতে পারে?, ১২) আপনার এ কাজ করার জন্য সরকারের কাছ থেকে অথবা জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে কোন লাইসেন্স(!) এনেছেন কিনা?, ১৩) আপনি কি আপনার পরিচয় পত্র দেখাতে পারবেন?, ১৪) আপনি ব্যাংক ঋনের ব্যাপারে জেনে কি করবেন?, ১৫) সরকার কি নতুন করে ব্যাংক থেকে কৃষি ঋন দেবে?, ১৬) সরকার কি ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋন সুদ সহ মওকুফ করবে?, ১৭) ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান বরাদ্দ কি বাড়ানো হবে?, ১৮) চেয়ারম্যান , মেম্বারদের কি জাতীয়ভাবে কোন বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে?, ১৯) ইউনিয়ন কমপ্লেক্স কি সরকার সত্যি বাস্তবায়ন

Dhaka University Institutional Repository

করবেন? ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রশ্নসমূহ ছাড়াও গবেষকের ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হয়। এ সব জিজ্ঞাসার কিছু নমুনা হলো-

১) আপনি কোথায় পড়াশুনা করেছেন?,২) আপনার বাবা মা কি করেন?, ৩) আপনি কি বিবাহিত?, ৪) আপনার বয়স কত?, ৫) আপনি এখনও বিবাহ করেন নাই কেন?, ৬) আমাদের এলাকায় বিবাহ করবেন কি?, ৭) আপনার কোন মেয়ে বন্ধু আছে কি?, ৮) আপনি কিকি খাবার খেতে পছন্দ করেন?, ৯) এই জায়গা আপনার কেমন লাগছে?, ১০) ঢাকায় আপনার নিজস্ব বাড়ী অথবা জমি আছে কি?, ১১) আপনার মাসিক আয় কত? ইত্যাদি।

মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় গবেষককে একটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যে অনেক অবান্তর প্রশ্ন শুনে কোনক্রমেই উত্তেজিত হওয়া যাবে না । বরঞ্চ সবার কথা মনোযোগ দিয়ে ধৈর্যর সংগে শুনতে হবে, সবাইকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সাবলীলভাবে তাদের প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এই ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বে যেন প্রশ্নকারী ও জবাবদানকারীর মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভীত সৃষ্টি হয়। কোন রকম বাধা ছাড়া ভাবে স্বাচ্ছন্দে ও বন্ধুত্বপূর্ন পরিবেশে যাতে এই পর্ব সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। গবেষককে ব্যক্তিগতভাবে সহজ ও আন্তরিকভঙ্গিতে সাক্ষাৎকার গ্রহন করতে হবে। এই কাজে গবেষক উপরোক্ত পদ্ধতি কাজে খাটিয়ে ভাল ফলাফল পেয়েছেন।

এই গবেষনা কর্মে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতায় মুখোমুখিও গবেষককে হতে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে থাকা খাওয়ার সুবিধা সব জয়গায় সমান নয়। একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার যাতায়াত ব্যবস্থাও বেশ কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ন ।

তথ্য সংগ্রহ ও সাক্ষাৎকার গ্রহন পর্বে যার কাছে যাওয়া হয়েছে তাকে বেশ আগে থেকেই সংবাদ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি। তবে সবক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাৎক্ষনিকভাবে চলতি পথে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এই কাজের সময়ে বিভিন্ন ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের বাসায়, মেম্বারদের বাসায়, কৃষক-ছাত্র, বিভিন্ন পেশাজীবিদের বাসায়, বিভিন্ন অফিসে গবেষককে থাকতে হয়েছে। এ সময়ে এলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। তবে এই সম্পর্ক গবেষনা কর্মে কোনরূপ প্রভাব ফেলে নি। এলাকার মুরব্বী শ্রেনীর (৬০ বছর বয়স উর্দ্ধ) কতিপয় মানুষের প্রিয় পাত্রও হয়েছিলাম।

মূলতঃ যে কোন গবেষনা কর্মেই মাঠ পর্যায়ের কাজে কয়েকটি সাধারন সুবিধা রয়েছে। অত্র গবেষকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বে যে সব সুবিধাজনক দিক লক্ষানীয় সেগুলো হলো ১)ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বে মানুষের স্বতঃফুর্ত সহযোগিতা লাভ করা যায়।২)একটি নির্দিষ্ট এলাকা সম্পর্কে ধারনা লাভ করা যায় এবং সেই সাথে দেশের অপরাপর এলাকার সাথে তার পার্থক্যসমূহ সহজেই ধরা পড়ে ৩) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বে গৃহিত তথ্য সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হয় ৪) বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা, তাদের প্রদত্ত মতামত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়,৫) এতে বিভিন্ন মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত চরিত্র, আচরন সম্পর্কে সম্যক অবহত হওয়া যায়, ৬) ভুল-ভ্রান্তি সহজেই ধরা পরে এবং সাক্ষাৎকার পর্বে কারো সাহায্য ছাড়াই তা শোধরানো সম্ভব হয়, ৭) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বে প্রাসংগিক উত্তর সঠিকভাবে পাওয়া যায়, ৮) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পর্বে স্পর্শকাতর প্রশ্নসমূহের জবাব সহজেই পাওয়া যায়। তবে এ সব প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

মাঠ পর্যায়ে কাজ চলাকালীন সময়ে একজন গবেষককে খুব সাবধানে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। অত্র গবেষনাকর্মে গবেষক এই সবগুলো পদ্ধতিই অনুসরন করেছেন। প্রাপ্ত তথ্যসমূহ অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে বিশ্লেষন করা হয়েছে। কেননা, প্রাপ্ত তথ্য সঠিকভাবে বিশ্লেষন না করলে গবেষনা ফলাফলে এর প্রভাব পরবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিজের প্রাপ্ত তথ্যের প্রতি গবেষক অবিচল থেকেছেন। সহায়ক তথ্য আমাকে সাহায্য করেছে মাত্র। তাই বর্তমান গবেষনাকর্মের ফলাফলের কোন কোন স্থানের সংগে সরকার প্রদত্ত তথ্যের অমিল রয়েছে।

যে কোন গবেষনা কর্মের অভিজ্ঞতা একান্তই ব্যক্তিগত। এই গবেষনা কর্মে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা সত্যিই তুলনাহীন।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত তথ্যপঞ্জী

Abunasar Shamsul Hoque (1970),"District Administration in East Pakistan:It'Classical form and Emerging Pattern",Administive Science Review.iv(1).

Alamgir,M.Khan(1980),Development Strategy for Bangladesh,Center for Social Studies, Dhaka University,Dhaka.

Ali Ahmed(1979),Administration of Local Self-Government for Rural Areas in Bangladesh,Dhaka:National Institute of Local Government.

Alvin Toffler(1981), The Third Wave,London:Pan Books Ltd.

Azizur Rahman Khan(1972),The Economy of Bangladesh,London:Macmillan Company.

__________________(1977),"Proverty and Inequality in Rural Bangladesh"in ILO Published Poverty and Landnessness in Rural Asia.Geneva:World Employment Programme.

Barkat-E-Khuda(1988),Rural Development and Change:Study of Bangladesh Village.,Dhaka:University Press Ltd.

Basham,A.L;(1989),The Wonder that Was India:A Survey of the History and Culture of the Indian Sub-Continent Before the Coming of the Muslims.,Delhi:Rupa & Co.

Bilquis Ara Alam and Roushan Ara Begum(1979),"Violence and the Union Parishad Leadership:A Few Statistics",Local Government Quarterly,viii(1-4).

Eliot Tepper(1966),Changing Patterns of Administration in Rural East Pakistan.,East Lansing:Asian Studies Center,Michigan State University.

Emajuddin Ahamed(1978),"Bureaucratic Elite in Bangladesh and their Development Orientations",Dhaka:Dhaka University Studies,xxxviii(June).

Dhaka University Institutional Repository

_____(1978),"Development Strategy in Bangladesh",Asian Survey. xviii(ii).

Faaland Just and Parkinson,J.R.;(1978),Bangladesh:The Test Case of Development,London:Oxford University Press.

Farouk,Abdullah;(1982),Changes in the Economey of Bangladesh,Dhaka:University Press Ltd.

Frank Long,(1978),"The Impact of Natural Disaster on Third World Agriculture",The American Journal of Economics and Sociology.37(2).

Galbraith John,K.,(1981),The Nature of Mass Proverty,(A Bengali Translation by Dr. Abdullah Fafouk),Dhaka:Ahmed Publishing House.

Ghatak,S. & Ingersent,Ken.,(1984),Agriculture & Economic Development,Sussex:The Harvester Press Publishing Group,Brighton

Gunnar Myrdal.(1958),EconomicTheorey and Underdeveloped Region.,Bombay:Vora & Co.

_____(1970),An Approach to Asin Dramma: Methodological and Theoritical.,New York:Vintage Books.

_____(1971),Asian Dramma;An Enquiry into the Poverty of Nations.,London:Allen Lane.

Hasan Uzzaman,(1982),Artha Samajic Vikash: British Shasanadhin Bharatbarsha-Bangladesh Ebong Tatkalin Britainer Madyaker Somparka (Ben.),Dhaka:Knowledge View.

Huq,Ejazul K.M.,(1984),The Basic Needs Approach: Planning for Core Needs in Bangladesh.,Dhaka:University Press Limited.

Jather,R.V.;(1964),Evolution of Panchayati Raj in India.,Dharwar:Institute of Economic Research.

John Mathi (1915),Village Government in British India.,London:T.Fisher Unwin Ltd.

Joseph La Palambara,(1963),"An Overview of Bureaucracy and Political Development.,New Jersey:Princeton University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Kamal Siddiqui,(1982),The Political Economy of Rural Poverty in Bangladesh.,Dhaka:National Institute of Local Government.

_____(1985),"Bangladesher Gramin Darridraw: Shawrup 'O' Shamadhan"(The Rural Poverty of Bangladesh:Nature and Soulution",Dhaka:Dana Pakashani.

Khan,Azizur Rahman;(1972),The Economy of Bangladesh.,Macmillan:St. Martin's Press.

Khan,S.D.;(1956),Notes on Reorganisation of Local Bodies in the Province.Dhaka:Government of East Pakistan.

Khursheed.K.A;(1988),The British in India:A Study in Imperialism.New Delhi:Indian Institute of Applied Political Research.

Kishor.C.Samal;(1997),"Retooling Rural Financial Institution",Economic and Political Weekly,8 February.

Lewis.Arthur W.;(1957),The Principles of Economic Planning.London:Routbdge of Kegan Paul.

Lincoln Chen (1974),An Analysis of Per Capita Foodgrain Availability :Consumption And Requirement in Bangladesh.Dhaka:Ford Foundation Report.No.24.

Lord Hailey (1954),"Foreword" to Hugh Tinker's Foundation of Local Self-Government in India,Pakistan and Burma.London:Athlone Press.

Lovett.H.V,(1958),"District Administration in Bengal :1818-1858", in H.H.Dodwell(ed),The Cambridge History of India.Delhi:S.Chand & Co.

Mellema.R.L.;(1961),"Basic Democracies System in Pakistan",Asain Survey,1(6).

Muzaffar Ahmed Chaudhuri (1968),"District Boards in Bengal and East Pakistan".Administrative Science Review.ii(4).

_____(1969),Rural Government in East Pakistan.Dhaka:Puthighar.

Nazmul Abedin (1973),Local Administration and Politics in Modernizing Socities:Bangladesh and Pakistan.Dhaka:Oxford University Press.

Dhaka University Institutional Repository

Peter J. Bertocci(1976),"Rural Development in Bangladesh:An Introduction" in Robert D. Stevens,Hamza Alavi and Peter J.Bertocci(eds),Rural Development in Bangladesh and Pakistan.Honolulu:The University Press of Hawai.

Philip B.Calkins(1970),"The Formation of Regionally Oriented Ruling Group in Bengal",Journal of Asain Studies,Vol-xxix(2).

Philip Woodruff (1954),The Man Who Ruled India:The Guardians.New York:Schocken Books.

Rahman.A.H.M.Aminur;(1990),Politics of Rural Local Self-Government in Bangladesh.Dhaka:University of Dhaka.

_____,(1977),"Union Parishad Nirbachan Nana Prashanga(Different aspects of the Rural Local Council Election),Local Government Quarterly,December.

_____(1978),"Bangladesher Arthanaitik Unnoyon Sadhaney Union Parishader Bhumika",(Role of the Rural Local Council in Economic Development of Bangladesh),Local Government Quarterly,December.

_____(1978),"Adequacy of the Union Parishad in the Fulfilment of it's Role",The Dhaka University Studies,Vol.39 ,No-2,December.

_____(1980),"Attitude of the Union Parishad Chairman towards Legalization of Abortion in Bangladesh",Bangladesh University Grants Commission,January.

_____(1985),"Rural Local Administration in Bangladesh in Historical Perspective",The Journal of Local Government,January-June.

_____(1989), Politico-Administrative Relationships in Development" in Emajuddin Ahamed(ed),Socites and Politics in Bangladesh.Dhaka:Academic Publishers.

_____(1986),"The Nature of Underdevelopment in the Rural Economy and the Development Stratigy of Bangladesh"Teaching Politics,Vol_2 & 3.

Dhaka University Institutional Repository

_____(1987),"Theoretical and Empirical Exploration in Rural Local Government",The Journal of Local Government,January-June.

_____(1987),Background of the Rural Local Leadership in Bangladesh",The journal of Local Government,July-December.

_____(1991),"Rural Local Self-Government in Bangladesh: Tends and Prospects",The Dhaka University Studies,Vol-48,No.1(June).

_____(1993),"Research in Local Government in Bangladesh:Concerns and Prioritias",The Dhaka University Studies,December-June.

_____(1995),"Research in Rural Local Self-Government in Bangladesh:Encounter and Experience". The Journal of Social Science Research,Vol-12,No 1 ,June.

Rahman,A.T.R. (1962), Basic Democracies at the Grassroots. Commilla: Pakistan Academy for Rural Development (Now Called Bangladesh academy for Rural Development.)

Rajni Kothari (1973), "The Political Economy of Employment." Social Change. III.(3&4)

Rashiduzzaman, M.(1968), Politics and Administration in the Local Councils: A Study of Union and District Councils in East Pakistan, Dhaka: Oxford University Prerss.

Rehman Sobhan, (1968), Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan,Dhaka: Bureau of Economic Research, Dhaka University.

Rene Dumont (1973). A self-Reliant Rural Development Policy for the Poor Peasants. of Sonar Bangla, Dhaka: Mimeographed.

Nicholas Cohen .(1980), The Growth of Hunger: A New Politics of Agriculture. London: Marion Boyars.

Roberts: P.E, (1939), History of British India. Oxford: Clarendon Press.

Robert Eric Frykenberg (ed.). (1969), Land Control and Social Structure, Madison: University of Wisconsin Press.

Rounaq Jahan (1976), "Members of Parliament, " Legislative Studies. 1(3).

Dhaka University Institutional Repository

Roy, Naresh C. (1936), Rural Self Government of Bengal. Calcutta: Calcutta University Press.

Salimullah and Shamsul Islam (1976), " A Note on Conditions of Rural poor in Bangladesh," The Bangladesh Development Studies; IV(2).

Sidney Webb, (1915), Preface to John Mathai's Village Government in British India. London: T. Fishes Unwin Ltd.

Sobhan,Rehmen & Muzaffar A. (1980), Public Enterprise in an Intermediate Regime: A Study of the Political Economy of Bangladesh, B.I.D.S.

Tanant, J,R. (1982), "Food Policy Conflicts on Bangladesh" World Development. X (2).

Tomasson F. Jannuzi and James T. Peach (1977), Report on the Hiarchy of Interests in Land in Bangladesh, Washington D. C; The United States Agency for International Development.

_____(1979), Bangladesh: A Profile of the Countryside. Washington D.C; The United States Agency for International Development .

United Nations (1997), Monthly Bulletin of Statistics, March, 1997 , (New York).

Ursula H.Hicks (1961), Development from below; Local Government and Finance in Developing Countries of the Commonwealth. Oxford: Clarendon Press.

World Bank (1980), World Development Report 1980, Washington D.C.

World Bank (1997), World Bank Atlas. 1997, Washington D.C.

World Bank (1997), World Development Report, 1997, Washington D.C.

Public Document

Government of Bengal (1872), Bengal Administration Report 1871-72, Calcutta: Bengal Scretariat press

_____(1882),"The Resolution on Local Self-Government", in Suppliment to the Gazette of India, Calcutta,20 May.

_____(1885),Bengal Code Act III.Calcutta:Government Press.

_____(1890),Papers Regarding the Villege and Indigenous Agency Employed in Bengal.Calcutta:Bengal Government Book Dept.

Dhaka University Institutional Repository

_____(1909),Report of the Royal Commission Upon Decentralization in India.Vol.I,London:HMSO.

_____(1914 a),Bengal District Administration Committee Report 1913-14, Dhaka:National Institute of Public Administration (Reprinted 1966),

_____(1914 b),Manuals of Circulars and Orders Relating to Local Bodies in Bengal.Calcutta:Bengal Secretariat Press.

_____(1918 a),Proceedings of the Bengal Legislative Assembly Debates.Calcutta.

_____(1918b),Report On Indian Constitutional Reforms. Calcutta: Superintendent of Government Printing Press.

_____(1945), Report of the Bengal Administrative Committe 1944-45, Alipore: Bengal Government Press.Also reprinted by National Institute of public Administration (Dhaka, 1962).

Government of Pakistan (1959),"Basic Democracies Order," in the Gazette of Pakistan. (Extra-Ordinary), Karachi, 27 October.

_____(1961), An Analysis of the Workings of the Basic Democracies Institutions in East Pakistan. Dhaka: Bureau of National Reconstruction (BNR) and the Pakistan Academy for Rural Development (PARD).

Governmen of Bangladesh (1972) The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (14 December).

_____(1973a) The Bangladesh Gazette Dhaka: : Ministry of Law and Parliamentary Affairs (30 June).

_____(1973 b) The Bangladesh Local Government (Union Parishad and Paurashava) Order, : Ministry of Law and Parliamentary Affairs.

_____(1973 c) The First Five Year plan 1973-78, Dhaka: Planning Commission.

Dhaka University Institutional Repository

_____(1976 a) Bangladesh Local Government (Union Parishad and Paurashava) Amendment Act.Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (December).

_____(1976 b), The Bangladesh Gazette. Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (30 June).

_____(1978), The Two- Year Plan 1978-80, Dhaka: Planning Commission.

_____(1980 a) The Bangladesh Gazette.(Extraordinary), Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (24 May).

_____(1980 c) The Second Five Year Plan 1980-85, Dhaka: Planning Commission.

_____(1982 a) Procedure for Processing of Development Projects in the Public Sector: Dhaka: Planning Commission.

_____(1982 b) Statistical Year Book of Bangladesh 1981, Dhaka: Ministry of Finance and Planning. Bureau of Statistics (27 September)

_____(1983) The Bangladesh Gazette.(Extraordinary), Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (12 September).

_____(1989a) The Bangladesh Gazette.(Extraordinary), Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (7 June).

_____(1989 b) The Bangladesh Gazette.(Extraordinary), Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (20 June).

_____(1992) The Bangladesh Gazette.(Extraordinary), Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (10 November).

_____(1993) The Bangladesh Gazette.(Extraordinary), Dhaka: Ministry of Law and Parliamentary Affairs (22 July).

_____(1996), Statistical Year Book of Bangladesh, 1996, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics .

_____(1998),), Statistical Pocket Book of Bangladesh, 1997, Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics .(January 1998)

Dhaka University Institutional Repository

Newspapers and Chronicles

The Bangladesh Times(Dhaka)

The Bangladesh Observer(Dhaka)

The New Nation(Dhaka).

The Daily Star(Dhaka)

The Daily Ittefaq(Ben.)

The Daily Dinkal(Ben.)

Agribusiness Bulletin, Dhaka: I. F. D. C.

Bangladesh:Fortnightly Bulletin,Dhaka: Department of Films and Publications(DFP).